প্রাচীন সভ্যতা

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ১৯২ সালের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য অন্যতম পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট)

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

তৃতীয় সংস্করণ

SEN BROTHERS & Co.,
PUBLISHERS AND BOOK-SELLERS,
College Street, Calcutta.

1918.

[মূল্য ৮০ আনা মাত্র

সূচীপত্র

অনুক্রমণিকা ... ... ৵০—৶০

১। মিশরের প্রাচীন সভ্যতা ১

২। বাবিলন ও আসীরিয়া ১৭

৩। ইউরোপে সারাসেন্ সভ্যতা ৩৩

৪। তুরস্ক রাজ্যের উৎপত্তি ৪৯

৫। চীন-জাতীয় সভ্যতা ৫৯

৬। আর্য্য সভ্যতার প্রাচীনতা ৬৭

৭। বহির্ভারত ৭৯

অনুক্রমণিকা

মানুষের বয়স কত ?

আমাদের জন্মভূমি এই পৃথিবীব বয়স ন্যূনকল্পে ৬ কোটি বৎসর বলিয়া তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মানব এই বৃদ্ধা বসুন্ধরার সর্ব্ব-কনিষ্ঠ সন্তান ; সর্ব্ববিধ জীব-জন্তুর জন্মের পর মনুষ্যের জন্ম। মানব-শিশু যে দিন সর্ব্বপ্রথম ধরিত্রী-জননীব ক্রোড় আশ্রয় করিয়াছিল, সে দিনের গণনা লইয়া এখনও সূক্ষ্ম বিচার চলিতেছে ; সম্ভবতঃ ইহা ১৫ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের কথা। পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে মানুষ যে এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছিল, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহা হইলেই দেখিতে পাইতেছি যে যথাসাধ্য বয়স কমাইয়া বিচার করিলেও আমাদের প্রত্যেকের শরীর, ৫।৬ লক্ষ বৎসরের ক্রমবিকাশের ফল বলিয়া স্বীকৃত হইবে। প্রত্যেক মানবের শরীর যখন ৫।৬ লক্ষ বৎসরের আবর্ত্তনে বর্ত্তমান যুগের পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে, তখন চেহারা দেখিয়া মানুষকে যত অল্পবয়স্ক মনে হয়, সে তত অল্পবয়স্ক নহে। মাতা বসুন্ধরার সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তানটি নিতান্ত খোকা নহেন।

৫।৬ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম হইলেও, বর্ব্বরতা পরিহার করিয়া "সভ্য" হইয়া উঠিতে মানুষের পক্ষে অনেক দিন লাগিয়াছিল। যেখানে মানুষ একটি সুনির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে পরস্পরে মিলিয়া মিশিয়া একটি সুতন্ত্রিত সমাজ গড়িতে পারিয়াছিল, আপনাদের রক্ষা এবং উন্নতির জন্য অবশ্য প্রতিপাল্য বিধি-ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিল, কল-কৌশল উদ্ভাবন করিয়া কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতিতে ধন-সম্পদ বাড়াইতে পারিয়াছিল, কেবল কথাবার্ত্তায় ভাবের

আদান-প্রদান শেষ না করিয়া মনের ভাবের উপাদানে স্থায়ী সাহিত্য-রচনা করিতে পারিয়াছিল, বংশক্রমে আপনাদের কীর্ত্তি ও গৌরবের কথা স্মৃত হইবার উপযোগী ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিল, সেইখানেই মানুষ সভ্য হইয়াছিল বলিয়া থাকি। কুত্রাপি মানুষের এই প্রকার সভ্যতালাভের ইতিহাস দশ হাজার বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া ধরিতে পারা যায় না। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে কেবল আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব্বভাগে নাইল নদীর উপত্যকাপ্রদেশে, অর্থাৎ মিশরদেশে এবং এসিয়ার পশ্চিম খণ্ডে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীধৌত প্রদেশে মানবের প্রাচীনতম সভ্যতার নিশ্চিত নিদর্শন পাওয়া যায়।

ভারতের আর্য্যসভ্যতা অতি প্রাচীন হইলেও, মিশরের সভ্যতার মত প্রাচীন কি না, তাহা প্রমাণিত হয় নাই। চীনদেশের সভ্যতাও সুপ্রাচীন, কিন্তু উহার তথ্য এখনও নির্ণীত হয় নাই। গ্রীস্‌দেশের সভ্যতা এবং ইতালীদেশের রোমক সভ্যতা প্রাচীন হইলেও অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিক। বিদ্যালয়ের সাধারণ পাঠ্যগ্রন্থে, ভারতীয়, গ্রীক এবং রোমক সভ্যতার বিবরণ থাকে ; সেই জন্য এই গ্রন্থে ঐ সকল বিবরণ দিলাম না। তবে ভারতসভ্যতার প্রাচীনতা সম্বন্ধে যে সকল কথা পাঠ্যগ্রন্থে উল্লিখিত হয় না, দুইটি প্রবন্ধে তাহার কথঞ্চিৎ উল্লেখ করা গেল। অর্ব্বাচীন হইলেও মুসলমান প্রভাবজাত যে সভ্যতা পশ্চিম এসিয়ায়, উত্তর আফ্রিকায় এবং ইউরোপের অংশবিশেষে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তাহার বিবরণ লিখিলাম ; কারণ ঐ বিবরণ বিদ্যালয়ের সাধারণ পাঠ্যগ্রন্থে থাকে না। বিভিন্ন জাতির প্রাচীনকালের সভ্যতার যে পরিচয় দিলাম, তাহা পড়িয়া পাঠকদের কৌতূহল অধিকতর উদ্দীপ্ত হইবে এবং তাঁহারা ঐ সকল বিষয়-সংবলিত গ্রন্থ পাঠ করিবেন, ইহাই আমার উদ্দেশ্য।

প্রাচীন সভ্যতা

মিশরের প্রাচীন সভ্যতা

মানচিত্রে আফ্রিকার উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তে যে ভূখণ্ড মিশর বা ইজিপ্ত নামে অঙ্কিত, উহাই হয়ত মানব-সভ্যতার প্রাচীনতম জননাস্পদ। ইউরোপীয় সভ্যতার মূল যে এই দেশের উর্ব্বর ক্ষেত্রে প্রোথিত, তাহা পণ্ডিতগণের সযত্ন অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ যুগে ইউরোপে অনেক কল-কৌশলের সৃষ্টি হইয়াছে, কৃষি শিল্প প্রভৃতির উন্নতির জন্য অনেক নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে; তবুও এখনও কৃষকের ক্ষেত্রে, শিল্পশালায় এবং গৃহস্থের গৃহে এমন অনেক অস্ত্র শস্ত্র এবং গৃহকর্ম্মের উপকরণ ব্যবহৃত হয়, যাহা অতি প্রাচীনকালে মিশর দেশে উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

মিশর হইতেই ভাস্কর শিল্প, চিত্রকলা, লিপি-কৌশল, জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রভৃতি গ্রীস দেশে সংক্রামিত হইয়াছিল এবং গ্রীসের সভ্যতাই রোম সাম্রাজ্যে বিকাশলাভ করিয়া সমগ্র ইউরোপে সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল।

সভ্যতার এই সুপ্রাচীন জন্মভূমির বিস্তৃতি তেমন অধিক ছিল না।

নাইল নদীর যে উপলবিষম অংশে নৌচালনাদি অসম্ভব ছিল তাহা মিশর দেশের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। যে স্থানে নাইল নদী অংশতঃ শৈল-বাধা এড়াইয়াছে, সেই স্থান হইতে ভূমধ্যসাগরের কূল পর্য্যন্ত মিশর দেশের দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০০ মাইল হইবে। কিন্তু দেশের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের বিস্তার অতি অল্প ছিল; কোথাও বা ১০ মাইল কোথাও বা ১২ মাইল। কেবল উত্তর প্রান্তে ভূমধ্যসাগরের দিকে ৩০।৩২ মাইল হইবে। পশ্চিম দিকের মরুক্ষেত্র অল্প পরিমাণে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলে সমগ্র মিশরের আয়তন ১২,০০০ বর্গ মাইলের অধিক হয় না। আমাদের বঙ্গদেশের প্রেসিডেন্সি বিভাগটুকুর আয়তন ১২,০০০ বর্গ মাইল।

রোমানদিগের অধিকারকালে মিশরের লোকসংখ্যা ৭০ লক্ষ ছিল। বঙ্গের প্রেসিডেন্সি বিভাগের লোকসংখ্যা এখন প্রায় ৯৫ লক্ষ। মিশর দেশটি নাইল নদীর পরিবাহ-পুষ্ট, অর্থাৎ এই দেশটি নাইল নদীর প্রবাহ-চালিত মৃত্তিকার সঞ্চয়ে গড়িয়া উঠিয়াছে। এরূপ দেশ স্বভাবতঃই উর্ব্বর; তবে বৃষ্টিপাত অধিক হয় না বলিয়া জলসেচন না করিলে ফসল জন্মে না। বঙ্গদেশের মাটি একটু আঁচড়াইয়া লইলেই প্রচুর শস্য-উপার্জ্জনের সুবিধা হয়; কিন্তু মিশরের কৃষককে দেশের উর্ব্বরা ভূমিকে জলসেচন করিয়া সরস করিয়া লইতে হয়। পরিশ্রমী এবং উদ্যোগী হইলেই বহু শস্য লাভ হয় বলিয়া ঐ নদী-মাতৃক দেশে লোকেরা উৎসাহী এবং কর্ম্মক্ষম হইয়াছিল। অল্পায়াসে যাহারা বেশি উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহারা নিশ্চেষ্ট এবং অলস হয়; অতি পরিশ্রমেও যাহাদের উপার্জ্জনের আশা অল্প, তাহারাও ভগ্নোদ্যম হইয়া কর্ম্ম-বিমুখ হয়। মিশরের প্রাকৃতিক অবস্থায় দেশবাসীরা উৎসাহী এবং কর্ম্মপটু হইয়াছিল। দেশটি গ্রীষ্মপ্রধান হইলেও বায়ু অতি বিশুদ্ধ এবং শুষ্ক

বলিয়া কাহাকেও তিলমাত্র ঘর্ম্মাক্ত হইতে হয় না। কাজেই অন্য গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের লোকের মত মিশরবাসীরা ক্লান্তি এবং অবসাদজনিত দৌর্ব্বল্য অনুভব করিত না। জলসেচন করিলে নিশ্চয়ই অপরিমিত শস্য লাভ হইবে জানিয়া দেশের লোকেরা আশা এবং উৎসাহপূর্ণ মনে বিবিধ কৌশলে নাইল নদী হইতে অসংখ্য খাল কাটিয়া সর্ব্বত্র জল-সেচনের ব্যবস্থা করিয়াছিল। এই জন্যই কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালী-চালনার বিবিধ বৈজ্ঞানিক উপায় অতি আদিম কালেই মিশরে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে যে প্রয়োজনের তাড়নাই উদ্ভাবনী শক্তির জননী। আদিম যুগে কোন দেশ আয়তনে বৃহৎ হইলে অধিবাসীদিগের পক্ষে একত্র মিলিয়া একটি জাতিরূপে পরিণত হওয়া দুঃসাধ্য হইত। কোন দেশ নাতিবৃহৎ হইলেও যদি সহজে অন্য দেশের লোক সে দেশে আসিতে পারিত, তাহা হইলেও মিলিত জাতি গড়িবার এবং দেশে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার সুবিধা হইত না। মিশরের পক্ষে প্রাচীনকালে এই প্রতি-কূল অবস্থাগুলি ছিল না। দেশের আয়তনের কথা বলিয়াছি। অন্য স্থান হইতে লোকেরা যে মিশরে প্রবেশ লাভ করিবার সুবিধা পাইত না, তাহা দেখাইতেছি। দেশের উত্তর ভাগের ভূমধ্যসাগর আদিম যুগে মানবের গতিবিধির বাধা-স্বরূপই ছিল; দেশের পশ্চিম তটে বহু বিস্তীর্ণ ভীষণ সাহারা মরুভূমি, মিশর দেশ অপেক্ষা ৬০০ হইতে ১,০০০ ফিট পর্য্যন্ত উর্দ্ধে অবস্থিত থাকিয়া বিষম প্রাকৃতিক বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। পশ্চিম দিকের মত পূর্ব্ব দিকেও দুস্তর মরুভূমি, এবং তাহার উপর আবার ঐ পূর্ব্ব প্রদেশ উচ্চ এবং নগ্ন শৈলমালায় পরিপ্লুত। দেশটি ত্রিভুজের মত অবস্থিত থাকিয়া যেখানে দক্ষিণ দিকে অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, সেখানেও পাহাড়গুলির বিষম বাধায় আফ্রিকার নিগ্রোজাতীয় লোকেরা মিশরে প্রবেশ করিতে পারিত না। অবাধে চারিদিকের সকল জাতিকে

দূরে রাখিয়া যাহারা অন্ততঃ ১০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে নাইল-ধৌত দেশে বর্ব্বরতা পরিহার করিয়া সভ্য হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা শারীরিক সৌষ্ঠবে এবং বর্ণের উজ্জ্বলতায় পূর্ব্বাঞ্চলের পেলেষ্টিন, আরব এবং ইরাণের অধিবাসী অপেক্ষা হীন ছিল না। এই জাতি সভ্য হইবার পূর্ব্বে অন্য কোন স্থান হইতে মিশরে আসিয়াছিল কি না, তাহা জানা যায় নাই; কিন্তু ইহাদের সভ্যতার আদিম বীজ যে মিশরেই উপ্ত হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ।

উন্নতিলাভের অতি শৈশবযুগেই মানুষেরা দিঙ্‌নির্ণয় করিতে পারে,—অর্থাৎ এইটি উত্তর, এইটি দক্ষিণ প্রভৃতি ভাব, দিগ্বাচক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে। মিশরের উন্নত প্রাচীন জাতি যখন ঐ দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দিগ্বাচক শব্দগুলি সৃষ্টি করিয়াছিল, তখন উহারা চিরকালই মিশরের অধিবাসী বলিয়া মনে হয়। "নাইল নদীর উজান" বলিতে যাহা বুঝায়, দক্ষিণ দিক বুঝাইতে ভাষায় ঠিক সেই শব্দ ব্যবহৃত ছিল। আবার নদীর ভাঁটার দিক ছিল উত্তর দিক এবং নদীর দক্ষিণ এবং বাম দিক পূর্ব্ব ও পশ্চিম নামে অভিহিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দিকে দুস্তর পর্ব্বত এবং উন্নত মরুভূমি ছিল বলিয়া "ঊর্দ্ধ গমন" শব্দে বিদেশ গমন বুঝাইত এবং "অবতরণ" শব্দে ঘরে ফিরিয়া আসা বুঝাইত। গ্রীস্ দেশের লোকেরা দেশটিকে কি কারণে Aigyptos সংজ্ঞা দিয়াছিল এবং ঐ দেশের জননীরূপিণী নদীটিকে কি অর্থে Neiles বা নাইল নাম দিয়াছিল তাহা জানিতে পারা যায় নাই। পেলেষ্টিন্ ও সিরিয়ার লোকেরা দেশটির যে নাম দিয়াছিল তাহা হইতেই আরবের ভাষায় "মিশর" শব্দ এসিয়ায় প্রচলিত হইয়াছিল। মিশরের লোকেরা কিন্তু আপনাদিগকে "মানুষ" বা রোমাতু বলিত, নাইল নামে খ্যাত নদীটিকে হা-পি বলিত এবং ঐ নদী-

সঞ্চিত কৃষ্ণমৃত্তিকার দেশকে কৃষ্ণমৃত্তিকাজ্ঞাপক "কমিৎ" শব্দে অভিহিত করিত। এই কমিৎ দেশের সভ্য রোমাতুগণ পূর্ব্বাঞ্চলের বিদেশটিকে তসেরিৎ বা রক্ত দেশ বলিত এবং দেশের উত্তর-পশ্চিম ভাগের কতকগুলি অধিবাসীকে "রেবু" নাম দিয়াছিল। পূর্ব্বদিকের মরুভূমি এবং পাহাড় রক্তাভ দৃষ্ট হইত বলিয়াই ঐ তসেরিৎ নামের উৎপত্তি হইয়াছিল; এবং হয়-ত বা রক্তবর্ণ দেশের সমুদ্র বলিয়া মিশরের ভাষায় যে সাগরের নামকরণ হইয়াছিল, সেই সাগর গাঢ় নীল জলে পরিপূর্ণ হইলেও, লোহিতসাগর নামে এখনও আখ্যাত হইয়া থাকে। মিশরের ভাষার বর্ণমালায় 'ল' একেবারেই ছিল না বলিয়া, লেবু বা লিবিয়ানেরা রেবু নাম পাইয়াছিল। এই রেবু জাতি মিশরের ইতিহাসের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। রেবু বা লিবিয়ানেরা মিশরের লোক অপেক্ষাও দেখিতে বেশী সুন্দর ছিল, পরে এক সময়ে উহারা দলে দলে মিশরে আসিয়া মিশরবাসীদিগের সহিত মিলিয়া গিয়াছিল।

মিশরের সুপ্রাচীনতার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। জ্যোতিষ্কপুঞ্জের গতি-বিধি নির্ণয় করিবার জন্য এড্‌ফু নগরে যে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং সেই মন্দির হইতে যে ভাবে কেনোপাস্ নক্ষত্রের উদয়াদি গণিত হইয়াছিল, তাহা অবলম্বন করিয়া প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ নর্ম্মান্ লকিয়র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ঐ মানমন্দির খৃঃ পূঃ ৬৪০০ সংবৎসরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময় হইতে ৮,০০০ বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে যে জাতির লোকেরা জ্যোতির্ব্বিদ্যায় অতখানি সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ করিয়াছিল, তাহাদের সভ্যতার সূচনা যে ঐ সময়ের সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বেই হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ থাকে না। এড্‌ফুর মানমন্দির নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্ব যুগেরও অনেক নিদর্শন Flinders Petrie প্রভৃতি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রায় খৃঃ পূঃ ৪০০০ সংবৎসর হইতে মিশর

দেশের স্থক্তের ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ; কারণ ঐ সময় হইতে রাজাদিগের সমাধিতে এবং অন্যান্য মন্দিরে, রাষ্ট্র সংবৎসর এবং সাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনা, অক্ষরে এবং চিত্রে খোদিত হইয়া আসিতে-ছিল। দেশের প্রথানুসারে রাজাদিগের শব যাহাতে চিরদিনের মত সুরক্ষিত থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া সমাধিস্থ করা হইত। এই সুরক্ষিত শব, "মামি" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ঐতিহাসিক যুগের মামিগুলি বিবিধ কৌশলে বস্ত্রগ্রন্থিতে বদ্ধ হইত এবং সমগ্র শব কোন প্রকার তৈল বা রসে নিষিক্ত হইত। শবগুলি পচিয়া যাইতে পারে নাই এবং মুখের চর্ম্মাদি কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইয়া বিকৃতিলাভ করে নাই। স্থক্তের ঐতিহাসিক যুগের বহুযুগ পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের যে কয়েকটি মামি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বিস্ময় বাড়িয়া যায়। এই স্থক্তের প্রাচীনকালের মামিগুলি কোন প্রকার বস্ত্রের আবরণে বা গ্রন্থিতে বদ্ধ হইত না; অথচ সেগুলি সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে রহিয়া গিয়াছে। ৮,৫০০ কিংবা ৯,০০০ বৎসর পূর্ব্বে যাহাদের জ্ঞানের উন্নতির এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাদের সভ্যতা ১০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে আরব্ধ হইয়াছিল বলিলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। মন্দিরের চিত্র ও লিপি এবং অন্যান্য খোদিত ও লিখিত বিবরণ হইতেই মিশরের ইতিহাস প্রধানতঃ সংগৃহীত হইয়াছে।

সভ্যতালাভের প্রথম যুগে মিশরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এডফু নগরের মানমন্দির নির্ম্মিত হইবার ২০০।৩০০ দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মিশর দেশ দুইটি রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। উত্তরে মিশর রাজ্যের রাজধানী নাইল নদীর ডেল্টা বা জলপ্রায় "কচ্ছ" প্রদেশে ছিল; এবং দক্ষিণ মিশর রাজ্যের রাজধানী এডফু নগরের অনতিদূরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে সময়ে দক্ষিণ

রাজ্যের নাম ছিল শুভ্র দেশ এবং উত্তর রাজ্যের নাম ছিল পাটল বা রক্তাভ দেশ। দক্ষিণ অঞ্চলের অধিবাসীরা জলবায়ুর গুণে হয়-ত বা অপেক্ষাকৃত অধিক গৌরবর্ণবিশিষ্ট ছিল বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়া থাকিবে। কচ্ছ প্রদেশে সূর্য্যের প্রখরতায় শরীরের বর্ণ কিঞ্চিৎ তাম্রাভ হওয়াই সম্ভব। উত্তর মিশরের রাজা পাটলবর্ণের মুকুট পরিতেন; মুকুটে মধুমক্ষিকা অঙ্কিত থাকিত এবং রাজচিহ্ন "বুটো" বা নাগিনী-মূর্ত্তিলাঞ্ছিত ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী দক্ষিণ মিশরের রাজা শুভ্র মুকুট পরিতেন; মুকুটে শ্বেতপদ্ম অঙ্কিত হইত, এবং রাজধ্বজায় সর্প-খাদক গরুড় বা ঈগল স্থাপিত হইত। মিশরের ভাষায় এই গরুড় বা ঈগলের নাম ছিল নেখবেট্। উত্তর এবং দক্ষিণ মিশরে সমভাবে সূর্য্যের প্রতিমা-স্বরূপে একটি বাজ পক্ষীর প্রতিকৃতি নির্ম্মিত হইয়া আদৃত হইত; অর্থাৎ সমগ্র মিশরদেশে সূর্য্যপূজা প্রচলিত ছিল। উত্তর এবং দক্ষিণ মিশরে তুল্যভাবেই সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। দক্ষিণ মিশরের প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্যার কথা বলিয়াছি। উত্তর মিশরেও ঐ বিদ্যার এত উন্নতি হইয়াছিল যে খৃঃ পূঃ ৪২৪১ অব্দে (অর্থাৎ ৬,০০০ বৎসর পূর্ব্বে) ৩৬৫ দিনের সৌরবৎসর গণিত হইয়াছিল। গ্রীকেরা ইহার তিন সহস্র বৎসরেরও অধিক পরে মিশরের এই সৌরবৎসর গ্রহণ করিয়াছিল; এবং গ্রীকদের নিকট হইতে ইউরোপীয়েরা ঐ গণনা গ্রহণ করিয়াছেন।

খৃঃ পূঃ ৩৪০০ অব্দে উত্তর এবং দক্ষিণ মিশরের রাজত্ব একত্র মিলাইয়া মেনেস্ নামক রাজচক্রবর্ত্তী একচ্ছত্র রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ক্ষমতাশালী সম্রাট বা ফেরাও মিশরের প্রথম রাজবংশের প্রথম সম্রাট বলিয়া প্রাচীন ইতিহাসে কীর্ত্তিত। উত্তর এবং দক্ষিণ মিশর মিলাইয়া যুক্তরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার চিহ্ন-স্বরূপে,

সম্রাট মেনেস্, তাঁহার নব-রচিত রাজমুকুটে উত্তর এবং দক্ষিণ রাজ্যের রাজমুকুটের বর্ণ এবং রাজচিহ্নাদি সমভাবে যোগ করিয়া লইয়াছিলেন, এবং উভয় রাজ্যের রাজধানীর প্রায় মধ্যবর্ত্তী স্থানে মেম্ফিস্ নগরে নব রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মেনেস্ তাঁহার নব রাজ্যে অভিষেক উৎসবের দিনে পরিচ্ছদের পশ্চাৎ ভাগে একটি সিংহের লাঙ্গুল পরিতে ভুলেন নাই। কারণ উত্তর ও দক্ষিণের উভয় রাজ্যেই পরাক্রম এবং আধিপত্যের চিহ্নস্বরূপে পশুরাজ সিংহের লাঙ্গুল পরিয়া রাজা-দিগকে অভিষেকের উৎসব করিতে হইত। প্রাচীন মিশরের ভাষায় অভিষেক উৎসবের নাম ছিল "লাঙ্গুলোৎসব"। এই মেনেসের সময় হইতেই মিশরের বিপুল সমৃদ্ধি এবং অতুল গৌরবের সূত্রপাত হয়। মেনেস্ মিশর রাজকুলের আদি বৈবস্বত মনু, অথবা মিশরের সূর্য্যবংশের আদি ইক্ষ্বাকু।

মিশরের ইতিহাস যাঁহারা কিছুই জানেন না, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে অত্যাশ্চর্য্য পিরামিডের কথা শুনিয়াছেন। মন্দিরের নামে এক একটি পাহাড়ের সৃষ্টি, মানব ক্ষমতার অতুল্য কীর্ত্তিস্তম্ভ। প্রথম এবং দ্বিতীয় রাজবংশেই এই কীর্ত্তি-স্থাপনের সূত্রপাত হয়; এবং চতুর্থ রাজ-বংশের রাজত্বের অবসানে খৃঃ পূঃ ২৭৫০ অব্দে উহার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। কিউফু নগরে বিশ বৎসর ধরিয়া নিরন্তর এক লক্ষ লোকের পরিশ্রমে যে পিরামিড্ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার একটু বর্ণনা করিবার প্রয়োজন। পিরামিডটি পরিপূর্ণ ৪০ বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া রহিয়াছে এবং উহার উচ্চতা ৪৮১ ফিট্। এই বিপুলায়তন মন্দিরটি গড়িতে যে ২৩,০০,০০০ সুসংস্কৃত মূল্যবান্ প্রস্তরখণ্ডের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেক খণ্ডের ওজন আড়াইটন বা ৬৮ মণ। কি উপায়ে ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে এই প্রস্তরগুলি তুলিয়া লইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়

না। এই পিরামিডগুলি সেকালের মিশরবাসীর বিদ্যা, কৌশল, সম্পদ, স্বাস্থ্য এবং শান্তির অলোপ্য সাক্ষী।

মেনেসের প্রভাবে একচ্ছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে মিশরের সহিত বিদেশে পরিচয় আরব্ধ হয়। খৃঃ পূঃ ৩৪০০ অব্দ হইতে ১৭৮৮ অব্দ পর্য্যন্ত বিদেশীয়েরা মিশরে প্রবেশ করিতে পারে নাই; কিন্তু মিশরের লোকেরা বিদেশের ধন-সম্পদ অনায়াসেই সংগ্রহ করিত। মেনেসের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বকালে দেশের পূর্ব্বভাগের পাহাড়গুলি হইতে স্বর্ণাদি ধাতু এবং বিবিধ শ্রেণীর মূল্যবান্ প্রস্তর সংগৃহীত হইত; কিন্তু মিশরবাসীরা কোন প্রতিবেশী জাতির রাজ্যে প্রবেশ করিত না। নূতন যুগে ক্ষমতার প্রসার বড় বাড়িয়া গিয়াছিল। সিরিয়া এবং পেলেষ্টিন অধিকৃত হইয়াছিল, সিনাই পর্ব্বত হইতে স্বর্ণাদি ধাতু সংগৃহীত হইতেছিল, ভূমধ্যসাগরে নৌ-চালনা করিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য চলিতেছিল এবং দেশের দক্ষিণ সীমায় পার্ব্বত্য অবরোধের কূলে কূলে আস্ওয়ান্ নগর স্থাপিত হইয়া নিগ্রো জাতির বিবিধ পণ্য ক্রীত হইতেছিল। আস্ওয়ান্ অর্থ হাট বা হাট-নগর।

মেনেস্ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম রাজবংশ হইতে দ্বাদশ রাজবংশের শেষ সময় পর্য্যন্ত আড়াই হাজার বৎসরেরও কিঞ্চিৎ অধিক কাল ধরিয়া মিশরদেশে সভ্যতার যতখানি উন্নতি হইয়াছিল, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। রাজা ছিলেন দেশের সর্ব্বজনপূজিত "রি" বা সূর্য্য দেবতার পুত্র; কাজেই তিনি দেবতার মত পূজিত হইতেন এবং তাঁহার সমাধির জন্য বিপুলায়তন মন্দির প্রস্তুত হইত। একটি পিরামিডের বর্ণনা করিয়াছি; কিন্তু পিরামিড ও মন্দিরাদির নিম্নতলে ভূগর্ভে যে ভাবে বহু বিস্তীর্ণ সমাধিগৃহ কক্ষে কক্ষে রচিত হইত, তাহা অল্প কথায় বর্ণনা করা যায় না। পারিবারিক অনুষ্ঠান, সামাজিক উৎসব, লোকসাধারণের

দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ, রাজাদের জৈত্র যাত্রা এবং বিজয়োৎসব প্রভৃতি, সমাধিস্থানে এবং মন্দির-কুট্টিমে যে প্রকার শিল্প-চাতুর্য্যে জীবন্তভাবে খোদিত এবং অঙ্কিত হইত, তাহাতে এ যুগের লোকেরাও অত্যন্ত বিস্মিত হয়েন। কেবল সেই ছবিগুলি দেখিয়াই সে কালের সমাজের ইতিহাস লেখা চলে। গ্রাসের লোকেরা প্রাচীন মিশরেব শিল্প অনুকরণ করিয়াই ভাস্কর বিদ্যায় উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তিল তিল করিয়া সৌন্দর্য্য কুড়াইয়া একটি কল্পিত তিলোত্তমা গড়ার নাম হইল ভাবাদর্শ (Ideal) সৃষ্টি। মিশরে এই ভাবাদর্শ সৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু গ্রীসে হইয়াছে। মিশরের লোক খাঁটি প্রকৃতিকে বড় ভালবাসিত এবং যথাযথভাবে গাছ-পালা, জীব-জন্তু এবং মানুষের প্রতিকৃতি গড়িত। মুখে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মনের ভাব এবং অবস্থা সম্পূর্ণ ফুটাইয়া এমন করিয়া এক একটি যথার্থ মানুষ গড়িত, যে সেই মূর্ত্তির বিশিষ্টতা দেখিয়া সকলকেই বিস্মিত হইতে হয়। যেরূপ ভাবে অসংখ্য খাল কাটিয়া চিরস্থায়ী জলসেচনের ব্যবস্থা হইয়াছিল, গুরুভার প্রস্তর তুলিয়া অতি উচ্চ পিরামিড নির্ম্মিত হইয়াছিল, যেরূপ সূক্ষ্মতায় সূর্য্যের অয়ন এবং নক্ষত্রের গতিবিধির পর্য্য-বেক্ষণ হইয়াছিল, এবং যে অপূর্ব্ব কৌশলে শবগুলি অবিকৃত রাখিয়া মামি প্রস্তুত হইত, তাহাতে প্রাকৃতিক শক্তিবিজ্ঞান, জ্যোতির্ব্বিদ্যা এবং বস্তুবিদ্যা কত উন্নত হইয়াছিল তাহার পরিচয় পাই। চিত্ত-বিনোদনের জন্য যে সকল কবিতা এবং অন্যবিধ সুকুমার সাহিত্য রচিত হইয়াছিল, তাহা একেবারেই লুপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন লিপির ভগ্নাংশ লইয়া উহার বিচার হইতে পারে না।

রাজার আদেশক্রমেই শাসন, বিচার প্রভৃতি সকল কার্য্য চলিত বটে, কিন্তু যথেচ্ছাচার ছিল না। রাজ্য-শাসনের জন্য, কর-সংগ্রহের জন্য, বিচার-কার্য্যের জন্য বাঁধা নিয়ম বা আইন প্রচলিত ছিল; কালোচিত

ব্যবস্থার জন্য রাজবিধি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইত, কিন্তু বংশক্রমে সকল রাজাই প্রচলিত বিধিগুলি মান্য করিয়া চলিতেন। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র যৌবন-সীমায় উপস্থিত হইলেই রাজকার্য্য শিখিতেন এবং দেশের প্রধান বিচারপতিরূপে নিযুক্ত হইতেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশগুলির শাসন-কর্ত্তারা প্রাদেশিক বিচারক ছিলেন, এবং যুবরাজের নিকট তাঁহাদের বিচার সমালোচিত হইয়া পরিবর্ত্তিত হইতে পারিত। নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে অপরাধীর দণ্ড বিধান হইত; কিন্তু কাহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ, স্বয়ং রাজা ভিন্ন অন্য কেহ দিতে পারিতেন না। রাজা সকল ভূমির অধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হইলেও প্রজারা আপনাদের অধিকারের ভূমি দান, যৌতুক এবং বিক্রয় প্রভৃতি দ্বারা হস্তান্তর করিতে পারিত। ভূমি হস্তান্তর করিলে তাহার সমস্ত বিবরণ লিখিয়া মন্ত্রীর নিকট দিতে হইত এবং মন্ত্রী উহা লেখ্য-ন্যাস গৃহে গচ্ছিত রাখিতেন। এখানেই বলিয়া রাখি যে পরে অষ্টাদশ রাজবংশের সময়ে রাজমন্ত্রীই রাজার অধীনে সর্ব্ব-প্রধান বিচারক নিযুক্ত হইতেন; এবং মন্ত্রীরা কদাচ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া বিচারবিভ্রাট ঘটাইতেন না বলিয়া প্রাচীন মিশরের ভাষায় অনেক প্রবাদবচন এবং দৃষ্টান্তকথা প্রচলিত ছিল। কৃষিক্ষেত্রে জলসেচনের সরকারী ব্যবস্থা সত্ত্বেও প্রজাদিগকে কর স্বরূপে উৎপন্নের $\frac{১}{৫}$ অংশ মাত্র দিতে হইত।

দেশের ধনী ব্যক্তিরা গৃহের চারিদিকে বাগান সাজাইয়া যে ভাবে মনোহর হর্ম্ম্য রচনা করিতেন, তাহারই অনুকরণে রোমান্ বড়মানুষেরা ভিলা প্রস্তুত করিয়াছিল। স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিত্ত-বিনোদনের জন্য স্ত্রী-পুত্রা লইয়া নৌকায় চড়িয়া খালে খালে পরিভ্রমণ এবং নৌকায় বসিয় গীত-বাদ্যের উৎসব প্রায় প্রতিদিনই অনুষ্ঠিত হইত। সকলেই নদী কিংবা খালে নামিয়া স্নান করিত এবং সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা মাটির কলসীতে জল বহিয়া আনিত। প্রাচীনকালের মাটির হাঁড়ি-কলসী

প্রভৃতির গড়ন অত্যন্ত মনোহর ছিল। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এক-পত্নী-গ্রহণই নিয়ম ছিল বলিয়া এ দেশের পারিবারিক সুখ মধুর ছিল বলিতে পারি। রাজাও বিধিমতে একটি পত্নী গ্রহণ করিতেন, এবং তাঁহার গর্ভজাত সন্তানই রাজ্যলাভে অধিকারী হইতেন। রাজা হইতে সাধারণ প্রজা পর্য্যন্ত কাহারও দৈনিক ব্যবহারের পরিচ্ছদে বস্ত্রবাহুল্য ছিল না। তবে পরিচ্ছদের ধরণ-ধারণ, অবস্থাবিশেষে বিভিন্নরূপ হইত। মন্দিরের পুত্তলিতে প্রাচীনকালের পরিচ্ছদের যে ছবি পাওয়া যায়, এখনও অনেক স্থানে মিশরবাসীরা সেইরূপ পরিচ্ছদ পরেন। স্ত্রীলোকেরা ঠিক অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকিতেন না ; তবে রাজপথে চলিয়া যাইবার সময় নাসিকার অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত অবগুণ্ঠন টানিতেন।

খৃষ্টোত্তর অষ্টম শতাব্দী হইতে অর্থাৎ মুসলমান অধিকারের পর হইতে মিশরবাসীরা তাহাদের প্রাচীন ধর্ম্ম, লিপি এবং ভাষা হারাইয়াছে ; কিন্তু আরবদেশের লোকেরা মিশরে বাস করিয়া এবং বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আকৃতিতে সম্পূর্ণরূপে মিশরের আদিম অধিবাসীদের মত হইয়া গিয়াছে। প্রবন্ধ-লেখকের চক্ষে এই আকৃতি অতি সুন্দর। এখন নাসিকার উপর একটি কারুকার্য্যবিশিষ্ট নল আঁটিয়া স্ত্রীলোকেরা যে ভাবে মুখের উপর একখানি সরু পর্দ্দা ঝুলাইয়া থাকেন, তাহা হয়-ত পূর্ব্বকালের জিনিষ নহে।

দ্বাদশ রাজবংশের রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ১৭৮৮ অব্দ পর্য্যন্ত মিশরের সর্ব্ববিধ উন্নতির অতি সংক্ষিপ্ত কথাই বলিলাম। ইহার পর ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ রাজবংশের ২০০ বৎসরব্যাপী রাজত্বের সময়ে "হিক্‌সস্" নামক পূর্ব্বাঞ্চলের একটি জাতি, মিশরে আসিয়া কিছু দিনের জন্য আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। মিশরের ইতিহাসে কলঙ্কের এই প্রথম দাগ পড়িল। এই হিক্‌সস্‌গণ য়ীহুদীদের অনুরূপ কোন

একটি প্রাচীন জাতি বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। বিদেশীয় আক্রমণের কোন ভয় ছিল না বলিয়া এ পর্য্যন্ত কোনরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ সামরিক নীতি প্রচলিত ছিল না। হিক্‌সস্‌দের আগমন এবং আধিপত্য অসহ্য হইয়াছিল বলিয়া, দেশে যে সামরিক বিধি-ব্যবস্থা সুতন্ত্রিত হইয়াছিল তাহাতে মিশরের উন্নতি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিয়াছিল। অষ্টাদশ রাজবংশের প্রথম রাজা আমোস্‌ হিক্‌সস্‌দিগকে দূর করিয়া দিয়া মিশরবাসীদিগকে পরাক্রান্ত জাতি করিয়া তুলিয়াছিলেন। দেশ-রক্ষার জন্য স্থায়ী সৈন্যবল রচনা করিয়া এই নূতন সম্রাট্‌ "থিবিস্‌" নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। যে সময়ে হিক্‌সস্‌গণ ক্ষণস্থায়ী প্রভুতা স্থাপন করিয়াছিল, সেই সময়ে স্বদেশীয় রাজপ্রভাবের দৌর্ব্বল্যের সুবিধায় পৌরহিত্যের প্রভাব বড় বাড়িয়াছিল। সূর্য্যোপাসক মিশর-বাসিগণের পরলোকের বিষয়ে বিশ্বাস অতি সরল ছিল। তাহারা বিশ্বাস করিত যে এ সংসারে যে যত পুণ্য কার্য্য করিতে পারে, পরলোকে সে তত সুখী হয়; কাজেই ইহলোকে সৎকার্য্য করিবার জন্য লোকের প্রবৃত্তি এবং চেষ্টা ছিল। পুরোহিতেরা ধর্ম্মতত্ত্বটিকে জটিল করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং লোকসাধারণকে বুঝাইয়াছিলেন যে, রাত্রিকালে সূর্য্য যখন পাতালে যান, তখন যদি সমাধিস্থ শবগুলির অঙ্গে পুরোহিতদের মন্ত্রপূতলিপিসংবলিত কবচাদি থাকে, তবে দেবতা সেই মন্ত্রের বলে সমাধিস্থ ব্যক্তির সকল পাপের মার্জ্জনা করিবেন। পূর্ব্বে কেবল রাজবংশের লোকেরই মামি প্রস্তুত হইত; কিন্তু এখন নূতন বিশ্বাসের ফলে অতি সাধারণ শ্রেণীর লোকেরাও মৃতের মামি প্রস্তুত করিয়া তাহার অঙ্গে পুরোহিতের মন্ত্রপূত কবচ বাঁধিয়া দিয়া পাহাড়ের যেখানে সেখানে সমাধি রচনা করিতে লাগিল। পুরোহিতেরাই কেবল দেবতত্ত্বজ্ঞ হইলেন, এবং পুরোহিত-পত্নীরা দেব-দাসী আখ্যা পাইলেন। সম্রাট্‌ আমোস্‌

১৫৮০ হইতে ১৫৬০ পর্য্যন্ত পুরোহিতদিগের প্রভাব ক্ষীণ করিয়া রাজ-শক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠার অনেক উদ্যোগ করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ রাজবংশের রাজত্বকালে পশ্চিম এসিয়ার অনেক জনপদ মিশরের আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল, এবং এসিয়ার দুইটি রাজবংশের সহিত মিশর রাজবংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। তৃতীয় আমেন্ হোটেপ, বাবিলনের কাশরাজবংশের রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া-ছিলেন। বাবিলনের সভ্যতার কথা বলিবার সময় এই কাশরাজবংশের পরিচয় দিব; কেবল উল্লেখ করিয়া রাখি যে আর্য্যজাতির কোন একটি শাখা হইতে কাশরাজবংশের উৎপত্তি। চতুর্থ আমেন্ হোটেপ্ বা ইক্‌ন-এটন্ 'মিটানি'র রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই মিটানি রাজ্যের একটু পরিচয় দিতেছি। খাঁটি ভারতবর্ষে বৈদিক যুগে যে সকল দেবতা পূজিত হইতেন, মিটানির রাজারা সেই সকল দেবতার পূজা করিতেন; এবং সম্ভবতঃ বৈদিক যুগের ভাষা ব্যবহার করিতেন। ইঁহাদের নিজের ভাষায় লিখিত লিপি বার্লিন নগরে রক্ষিত আছে এবং এখনও উহার পাঠোদ্ধার হয় নাই। একালের মেসোপোটেমিয়া রাজ্যে মিটানি রাজ্য অবস্থিত ছিল।

অষ্টাদশ রাজবংশের সুপ্রসিদ্ধ ফেরাও চতুর্থ আমেন্ হোটেপ্ মিশরের ধর্ম্ম-বিশ্বাসে নবযুগ আনিয়াছিলেন। তিনি প্রচার করিলেন যে অসভ্য নিগ্রো হউক বা সুসভ্য রোমাতু (মিশরবাসী) হউক, কামিৎ (মিশর) দেশ হউক কিংবা দূরস্থ শত্রুরাজ্য হউক, সকল জাতির এবং সকল দেশের এক অধিপতি রহিয়াছেন; এবং সেই অধিপতি এটন্ বা সর্ব্বময় ঈশ্বর। দেশপূজিত সূর্য্য তাঁহার মহিমার সাক্ষী বলিয়া সূর্য্যকে উপলক্ষ্য করিয়া পূজা চলিতে পারে, কিন্তু যথার্থ পূজা কেবল এটন্‌কেই করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন যে এটন্ সূর্য্যের সূর্য্য, এবং যে উত্তাপ সূর্য্যে, পৃথিবীতে

এবং জীবনে অনুভূত হয়, এটন্ তাহার উৎস। নিজের আমেন্ হোটেপ্ নামেই আমন দেবতার নাম অঙ্কিত ছিল বলিয়া, তিনি নামের পরিবর্ত্তন করিয়া আপনার নাম রাখিলেন ইখনেটন্ বা এটন্‌সেবক। দেশের ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরের দেবতাগুলি মিলাইয়া এটনের অধীন করিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে "রি," আমন এবং "প্তা" স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া এটনে বিলীন হইলেন। খৃঃ পূঃ ১৩৭৫ অব্দে এই দেবতত্ত্ব পেলেষ্টিনে সংক্রামিত হয়, এবং য়াহুদীদের ধর্ম্ম নবভাব ধারণ করে। এই ফেরাও বা সম্রাট্, এটনের নামে নূতন মন্দির স্থাপন করিয়া যে নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাও এটন্ নামে নামাঙ্কিত হইয়াছিল। একেশ্বরবাদের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠার নগরটি এখন তেল্-এল্-অমরণা নামক স্থানের ভগ্নস্তূপে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

ইহার পরেও বহুশতাব্দী ধরিয়া অনেক রাজবংশও মিশরের স্বাধীনতা এবং গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ১২০০ অব্দে যখন মিশরের গৌরব কথঞ্চিৎ মলিন হইয়া আসিতেছিল, প্রায় সেই সময়ে গ্রীসের অভ্যুত্থান বলিলে ক্ষতি হয় না।

এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে আসীরিয়া রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত ফেরাও-দের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে জাতির বলক্ষয় হইতেছিল। অনেকবার লিবিয়নদের আক্রমণ অপসারিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু দুই এক শতাব্দী পরেই রেবু বা লিবিয়ন জাতি মিশরে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। লিবিয়নেরা মিশরের কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই, এবং যেমন করিয়াই হউক, মিশরবাসীরা খৃঃ পূঃ ৭০০ অব্দ পর্য্যন্ত প্রাচীন প্রথা অনুসারেই রাজত্ব চালাইয়াছিল। এই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তের নিউবিয়ার শাসনকর্ত্তারা একবার স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া মিশরের অধিপতি হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং আসীরিয়ার রাজা

৬৬৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মিশরের নিকট হইতে কর আদায় করিয়াছিলেন। আসীরিয়ার প্রভাব দূর করিয়া এবং নিউবিয়াকে পদানত করিয়া মিশরের ফেরাও পূর্ব্বগৌরব স্থাপন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভাগ্যবিপর্য্যয়ে সমস্ত উদ্যোগ ব্যর্থ হইয়া গেল। খৃঃ পূঃ ৫২৫ অব্দে পারসিক ভূপতি কেম্বাইসেস্ মিশর দেশ জয় করিয়া আত্মরাজ্য-ভুক্ত করিলেন। সভ্যতার আদিম জননাস্পদ যখন পারসিক-পদ-লাঞ্ছিত হইল, তখন ভারতগৌরব মহাত্মা বুদ্ধদেব নব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া প্রাচীন ভারতের মাহাত্ম্য বর্দ্ধন করিতেছিলেন।

পারসিক কর্ত্তৃক বিজিত হইবার পর মিশর আর মাথা তুলিতে পারে নাই। আলেকজান্দারের সময়ে দেশটি গ্রীক্‌দের পদানত হইয়াছিল; এবং তাহার পর রোমানদের অধীনে দেশের জীবনীশক্তির ক্ষয় হইয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমানেরা যখন মিশর অধিকার করিয়া-ছিল তখন প্রাচীনতার আর প্রাণ ছিল না বলিয়াই ধর্ম্ম, ভাষা এবং লিপি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। অতি গৌরবের কমিৎ দেশের রোমাতু-গণ এখন আরবী ভাষায় কথা কহে এবং আরবের ধর্ম্ম ও সাহিত্যের আলোচনা করে।

বাবিলন ও আসীরিয়া

উত্তরে তুর্কীস্থান, এলবর্জ পর্ব্বত, ককেসাস্ পর্ব্বত এবং কৃষ্ণসাগর; পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, সুয়েজের খাল* এবং লোহিতসাগর; দক্ষিণে আরব সমুদ্র এবং পূর্ব্বে সিন্ধুনদীর পশ্চিমকূলবর্ত্তী ভূভাগ, এই সুবিস্তীর্ণ পশ্চিম এসিয়া, স্মরণাতীতকাল হইতে বিবিধ জাতির সংঘর্ষণে এবং মিশ্রণে বহুযুগব্যাপী রাষ্ট্রবিপ্লবে, নানা ভাবে পরিবর্ত্তিত এবং বিধ্বস্ত হইয়া আসিয়াছে। সভ্যতা-বিকাশের প্রথম যুগে, এই পশ্চিম এসিয়ার প্রায় মধ্যবর্ত্তী স্থলে টাইগ্রিস্ এবং ইউফ্রেটিস্-ধৌত দেশে যে নরলীলা অভিনীত হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

নিভৃতে পর-সম্পর্কশূন্য হইয়া মিশর যেরূপভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, বাবিলনের পক্ষে তাহা ঘটে নাই। দক্ষিণভাগের পারস্য উপসাগর অতি প্রাচীনকালে দুস্তর প্রাকৃতিক বাধা ছিল বটে, কিন্তু পূর্ব্বভাগের ইলাম পর্ব্বত কিংবা উত্তরদিকের পর্ব্বতমালা কখনও বহির্ভাগের জনস্রোতকে বাধা দিতে পারে নাই। আরব সীমান্তের যাযাবর জাতির লোকেরা এই দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম তীরস্থ মরুভূমি অনায়াসেই পার হইতে পারিত; এবং ইউফ্রেটিসের পশ্চিম কূল হইতে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ, বর্ণিত দেশটুকুর পশ্চিমতটে সর্ব্বদাই উন্মুক্ত ছিল। তথাপি কি সুবিধায় এই দেশটির উত্তর-পূর্ব্বের পার্ব্বত্য ভূমিতে আসীরিয়া রাজ্য, এবং সমুদ্র-কূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত মুক্ত উপত্যকায় বাবিলন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া

* এই খালটি যে ইউরোপীয়দের একালের কীর্ত্তি, তাহা সকলেই জানেন; প্রাচীন-কালে ইহার অস্তিত্ব ছিল না।

প্রাথমিক যুগের নরসভ্যতা বিকাশ করিতে পারিয়াছিল, তাহা সহজবোধ্য নহে। এই নাতিবৃহৎ দেশের প্রদেশ-সংস্থানের কথা বলিতেছি। যেখানে টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিসের ধারা একত্র মিলিয়াছে, সেই স্থান হইতে যুক্তধারায় উভয়কূল-পথে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত প্রসারিত প্রদেশটি "সামুদ্রিক প্রদেশ" নামে পরিচিত ছিল, এবং নদীদ্বয়-ধৌত উত্তর প্রদেশ বাবিলন বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিল। বাবিলনের উত্তরে যে ত্রিভুজাকৃতি-বিশিষ্ট প্রদেশটুকু একদিকে টাইগ্রিস্ এবং জাব নদীর দুইটি ধারায় বেষ্টিত এবং অন্যদিকে মিডিয়ার পর্ব্বতশ্রেণীতে রুদ্ধ, উহাই আদিম আসীরিয়া রাজ্য ছিল।

প্রথমে সামুদ্রিক প্রদেশের, তাহার পর খাঁটি বাবিলনে এবং তাহার পর আসীরিয়ায় সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কোন্ জাতি কবে প্রথমতঃ সামুদ্রিক প্রদেশে এবং পরে বাবিলনে সভ্য হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার বিবরণ যে ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার অত্যল্প আভাস দিবার প্রয়োজন। সমুদ্রকূল হইতে আসীরিয়ার দক্ষিণসীমা পর্য্যন্ত কুত্রাপি একখানি পাথর খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব; এইজন্য হয়-ত এ দেশের লোকেরা চমৎকার ইট্ প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল।

আমরা ইট্ দিয়া ঘরবাড়ি গড়িবার কথাই জানি, কিন্তু ইটের যে পুস্তক হয় তাহা জানি না। অতি প্রাচীনকালে এ দেশের লোকেরা কাঁচা ইটের উপর অক্ষর লিখিয়া ঐ ইট পোড়াইয়া যে সকল পুস্তক রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, যুগ-যুগান্তের পরে সেই লিপি অবলম্বন করিয়াই প্রধানতঃ বাবিলনের প্রাচীন ইতিহাস রচিত হইয়াছে। প্রাচীনতম লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া জানিতে পারা গিয়াছে যে প্রথমে "সুমের" নামে একটি জাতি সামুদ্রিক প্রদেশে সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল। এই সুমের জাতির উৎপত্তির ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। উহাদের ভাষার প্রকৃতি

আলোচনা করিয়া অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন, যে উহারা আর্য্য নামক জাতির শাখাবিশেষ ছিল। যাহাদের ভাষা আর্য্যভাষার অনুরূপ, তাহারা আর্য্যবংশের লোক না হইলেও যে সভ্য হইবার পূর্ব্বে আর্য্য নামে খ্যাত জাতির সংস্পর্শে আসিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। ইতিহাসের এই ক্ষুদ্র কণিকাটুকু ভারতবর্ষের আদিম সভ্যতার তথ্য নির্ণয়ে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারে। বাবিলনের ধ্বংসাবশেষ হইতে মুখ্যতঃ যে জাতির কীর্ত্তি-কথা সংগৃহীত হইতেছে, তাহারা অজ্ঞাত "সুমের" জাতি এবং আরব প্রভৃতি দেশের সেমেটিক্ নামে পরিচিত জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। সেমেটিকেরা সুমেরদিগকে জয় করিয়া বাবিলনে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা সুমেরগণের ধর্ম্ম এবং সভ্যতা অবলম্বন করিয়াই বড় হইয়াছিল। সুমের এবং সেমেটিকের সম্মিলনে উৎপন্ন জাতিই বাবিলনের প্রভুতা-সম্পন্ন প্রাচীন জাতি। এই সম্মিলিত প্রাচীন জাতির প্রথম ঐতিহাসিক কীর্ত্তি খৃঃ পূঃ ৪৫০০ অব্দে অঙ্কিত হইয়াছিল। কাজেই পূর্ব্ববর্ত্তী খাঁটি সুমের সভ্যতা যে উহার বহুযুগ পূর্ব্ব হইতে বর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু সে যুগ কত প্রাচীন, কেহ তাহা বলিতে পারে না; হয়-ত বা মিশরের সভ্যতাবিকাশের দিনের অধিক পরবর্ত্তী নহে।

বাবিলনের মিশ্রজাতির প্রাথমিক অভ্যুদয়ের যুগে সমগ্র বাবিলনে এবং সামুদ্রিক প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ সময়ের প্রাচীনতম যে একটি রাজার নাম পাওয়া যায়, তাঁহার নাম এন্-শাগ-কুষাণ। এই সময়ে দেশের বাবিলন নাম হয় নাই। সমগ্র বাবিলন এবং সামুদ্রিক প্রদেশ "কেঙ্গি" নামে অভিহিত ছিল। "কেঙ্গি" অর্থ ছিল নলবহুল নদীধৌত দেশ। এই অতি প্রাচীন কালে, কেবল লিপি-কৌশল জানা ছিল তাহাই নয়, মিশরের সহিত

সম্পূর্ণ অপরিচিত কেঙ্গিবাসীরা নদী হইতে খাল কাটিয়া কৃষিক্ষেত্রের জন্ত জলসঞ্চয় করিবার কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিল। ইউফ্রেটিস্ নদীর বহু উত্তর ভাগে, যেখানে নদীটির শাখা বিস্তার করিবার কোন প্রাকৃতিক সম্ভাবনা নাই, সেখান হইতে দেশের পশ্চিমভাগের মরুভূমিকে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়া স্বাধীন ধারায় যে প্রবাহিণীটি পারস্য উপসাগরে পড়িয়াছে, তাহা কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালী বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। সত্য হইলে এই একটি কীর্ত্তিই প্রাচীন উন্নতির যথেষ্ট সাক্ষী। দেশটিতে এই সময়ে কোন নগরে বা চন্দ্র, কোন নগরে বা সূর্য্য প্রধানরূপে পূজিত হইতেন, এবং রাজারাই দেবতার "পতেশি" বা রক্ষক ছিলেন।

গ্রীস্ দেশের লোকেরা খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে "নিজের চোখে দেখা" বলিয়া যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়। অতি-রঞ্জিত মনে করিয়া কিছু বাদসাদ দিয়া ঐতিহাসিকেরা যাহা ধরিয়া লইয়াছেন, তাহা এই যে—গম, যব, ধান প্রভৃতি শস্য প্রতিসের বীজে প্রায় দুই মণ হইত। গম এবং যব নাকি এত বাড়িয়া উঠিত যে একবার পাতাগুলি গরু দিয়া মুড়াইয়া খাওয়াইয়া না দিলে শস্য হইত না, এবং শস্য হইলে উহার শীষ প্রায় দেড় গজ লম্বা হইত, এবং এক একটি গম বা যব এক ইঞ্চি প্রশস্ত হইত। এই রকমের যব লইয়াই আমাদের এক যবের মাপ নহে ত? গম এবং যব যে এই দেশে স্বতঃপ্রসূত এবং এখান হইতে গিয়াই যে ঐ শস্য ইউরোপের ক্ষেত্রে উপনিবেশ করিয়াছিল, তাহা বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করেন। শেব্ বা এপ্‌ল, বাদাম, খুবাণী বা এপ্রিকট, পেস্তা, দ্রাক্ষা প্রভৃতি অপর্য্যাপ্ত হইত এবং এখনও হয়। এ দেশের খেজুর অতি সুখাদ্য; যে ফুলে খেজুর ফলিত, সেই ফুলের উপর খেজুর গাছের পুরুষ ফুলগুলির রেণু ঝাড়িয়া দিয়া খেজুর ফলাইবার বিদ্যা অতি প্রাচীনকালেও জানা ছিল। খেজুরের গাছ কাটিয়া সুপেয় রস

এবং মদ্য প্রস্তুত হইত। খৃষ্টোত্তর ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এ দেশের নলবনে হাতী বেড়াইত; কিন্তু সহসা ঐ সময়ে একেবারেই লুপ্ত হইয়া গেল। এখানে পূর্ব্বকালে যে সিংহ ছিল, উহারা আকৃতিতে আফ্রিকার সিংহ অপেক্ষা খর্ব্ব হইলেও দেখিতে সুন্দর ছিল; জটাবাঁধা কাল রঙ্গের কেশর বড় সুন্দর দেখাইত।

বাবিলনের ইতিহাসে দুর্জ্ঞেয় সুমের জাতির সভ্যতার এই প্রভাবটুকু লক্ষ্য করা যায় যে, সেমেটিক বংশের আকাদ্ নামে খ্যাত জাতির লোকেরা বাবিলন জয় করিবার পর সম্পূর্ণরূপে সুমেরদের সহিত মিলিয়া গিয়াছিল এবং সর্ব্বাংশে সুমেরদের সভ্যতায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। প্রাচীন আকাদ্দের বাবিলন জয়ের কোন ধারাবাহিক বিবরণ সংগৃহীত হইতে পারে নাই, কেবল ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনা পাওয়া গিয়াছে। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪০০০ অব্দ হইতে আকাদ্দের ভিন্ন ভিন্ন দলের বাবিলন-জয়ের বিববণের মধ্যে ৩৭৫০ অব্দের বিবরণটি প্রধান; ঐ সময় সারগন্ কর্ত্তৃক সমগ্র বাবিলন রাজ্য জিত হইয়াছিল। এই সময় হইতে বাবিলনের সকল রাজার নামেই "সুমের এবং আকাদ্ অধিপতি" আখ্যা যুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আকাদেরা সূর্য্য এবং চন্দ্রের পূজা ছাড়াও তারকা বা ইস্তার পূজার এবং মার্দুক পূজার আমদানি করিয়াছিল, এবং মার্দুক বাবিলনের প্রধান দেবতা হইয়াছিলেন।

বাবিলনের উন্নতির প্রথম যুগে প্রতিবেশী জাতিদের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা সম্পূর্ণ জানা যায় না। অনেক পরবর্ত্তী সময়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে মনে হয় যে আরব দেশটি বাবিলন কিংবা আসীরিয়া কর্ত্তৃক কখনও সম্পূর্ণরূপে বিজিত না হইলেও, আরবের লোকেরা প্রাচীন কালে সুতন্ত্রিত রাজ্য কিংবা কোন প্রকারের সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই; দুস্তর মরুভূমির পারে কোন প্রকারে বর্ব্বরোচিত স্বাধীনতা

রক্ষা করিতেছিল মাত্র। য়ীহুদীগণ খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দের পূর্ব্বে পেলেষ্টিন বাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই; উহার পূর্ব্বে ঐ দেশের সেমেটিক্‌জাতীয়েরা মিশরের অধীনে থাকিয়া কিরূপ সামাজিক-জীবন যাপন করিত, তাহার সুস্পষ্ট ধারণা হয় না। বাবিলন এবং সীরিয়ার মধ্যবর্ত্তী মিটানি বা মিত্তানি রাজ্যটুকুর কথা প্রসঙ্গ-ক্রমে পরে বলিব। আকাদবংশীয় সারগনের রাজত্বকালে (৩৮০০ খৃঃ পূঃ) সীরিয়া পর্য্যন্ত বাবিলনের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল; এবং ঐ প্রদেশ হইতে মন্দিরাদি নির্ম্মাণের জন্য সর্ব্বদাই উৎকৃষ্ট প্রস্তরাদি সংগৃহীত হইত। মিশরের প্রাচীনকালের অধিপতিগণও এই স্থান হইতে বহুমূল্য খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করিতেন। কাজেই প্রাচীনকালে সীরিয়ার কোন প্রাধান্য ছিল মনে করিতে পারা যায় না।

ফিনিসিয়ান্‌ নামে খ্যাত অতি প্রাচীনকালের বণিক জাতি, সীরিয়ার প্রান্তে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। লিবেনন্‌ পর্ব্বত হইতে ভূমধ্যসাগরের কূল পর্য্যন্ত ইহাদের বসতি ছিল বটে, কিন্তু কখনও ইহারা সামরিক গৌরব লাভ করিতে পারে নাই, অথবা রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারে নাই। ইউরোপ, এসিয়া এবং আফ্রিকার অনেক-স্থলেই ফিনিসিয়েরা বাণিজ্য করিয়া বেড়াইত বটে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। খৃঃ পূঃ ৩৮০০ অব্দেও ইহাদের বণিক বৃত্তির কথা জানা যায়; কিন্তু যাহাকে সামাজিক সভ্যতা বলে, তাহা ইহাদের মধ্যে কিরূপ বিকশিত হইয়াছিল জানা যায় না। এক সময়ে ইহারা মিশরের আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল, এবং মিশরের লিপিকৌশল ও অন্যান্য সভ্যতার ফল আহরণ করিয়াছিল। পরে আবার বাবিলনের প্রভাবের অধীনে আসিয়া বাবিলনের সভ্যতা আপনাদের অঙ্গীভূত করিয়াছিল। এই ফিনিসিয়দের নিকট হইতেই গ্রীসের লোকেরা বর্ণমালা এবং

অন্যান্য সভ্যতার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিল। সারগনের সময় হইতেই দেখিতে পাই যে, লিবেননের কাঠ-পাথর সর্ব্বদাই বাবিলনে নীত হইত, এবং কখনও সেখানে বাধা দিবার কেহ ছিল না।

বাবিলনের পশ্চিমভাগের দেশগুলির কথা বলিলাম। পশ্চিমভাগে বাবিলনের রাজাদের গতি যে প্রকার অপ্রতিহত ছিল, পূর্ব্বভাগে সেরূপ ছিল না। আর্য্যসভ্যতা-বর্দ্ধিত পারসিকেরা খ্যাতি লাভ করিবার পূর্ব্ব-যুগে, ইলাম-পর্ব্বত-প্রান্তে এবং মিডিয়া রাজ্যে কোন্ জাতি কি ভাবে বাস করিতেছিল, তাহা জানা যায় না বটে, কিন্তু উন্নত এবং ক্ষমতাশালী বাবিলনের লোকেরা যে কদাচ পূর্ব্বাঞ্চলে অধিকার বিস্তার করিতে পারে নাই, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। লিবেনন্ এবং সীরিয়া হইতে কাঠ-পাথর আনিয়া যাঁহারা মন্দির গড়িতেন, তাঁহারা অতি নিকটবর্ত্তী দেশ হইতে উহা সংগ্রহ করিতে পারিতেন না কেন, তাহা ভাবিবার কথা। বাবিলনের প্রথম প্রভাবের দিনে যে ত্রিভুজাকৃতিবিশিষ্ট পর্ব্বতসঙ্কুল দেশে আসীরিয়া রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা বলিয়াছি, আসীরিয়ার লোকেরা সাহসপূর্ব্বক যখন বাবিলনের দিকে অগ্রসর হইতে পারে নাই, তখনও কিন্তু ক্ষমতাশালী বাবিলনের রাজারা আসীরিয়া অধিকার করিতে পারেন নাই, অথবা সেখানকার অতি সহজলভ্য উৎকৃষ্ট প্রস্তর এবং বহু-মূল্য খনিজ পদার্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আসীরিয়ার রাজ্য ক্ষুদ্র হইলেও সে সময়ে ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল বলিয়া মনে হয়। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, আসীরিয় লোকেরাও ইলাম বা মিডিয়ার দিকে অগ্রসর না হইয়া অনুর্ব্বর পর্ব্বতসঙ্কুল দেশেই বাস করিতেছিল।

যে যুগে সারগন্ এবং তাঁহার বংশধরেরা দিগ্বিজয়ী হইয়া প্রভুতা বিস্তার করিতেছিলেন, সেই যুগেই আসীরিয়ার স্বাতন্ত্র্য এবং সভ্যতার কথঞ্চিৎ নিদর্শন পাওয়া যায়। খৃঃ পূঃ ৩০০০ অব্দে যে নিনেভে নগরে

আসীরিয় রাজারা "অসুর"-দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহা এখন প্রমাণিত হইয়াছে। যাহাদের রাজাদের নাম ইষ্টদেবতা "অসুরের" নামে লাঞ্ছিত হইত, এবং যাহাদের সমগ্র দেশ এবং জাতির নাম ঐ দেবতার নামে নামাঙ্কিত, তাহারা যে সম্পূর্ণরূপে বাবিলনের সভ্যতার প্রভাবেই মানুষ হইয়া উঠিয়াছিল, এ কথা স্বীকার করা যায় না। যাহারা প্রকৃত পক্ষে বাবিলনের সহিত সম্পর্কশূন্য ছিল, তাহারা আর্য্য-দের প্রাচীন "অসুর" দেবতার নাম কোথায় কি ভাবে সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান হয় নাই। আসীরিয়ার প্রাচীন অধিপতিগণ, "রাজা" শব্দের অর্থে "ইশাকৃকু" শব্দে আখ্যাত হইতেন। ইশাকৃকু শব্দের অর্থে দেবভক্ত এবং দেবরক্ষক সূচিত হয়।

প্রায় খৃষ্ট পূর্ব্ব ২৩০০ অব্দে এবং তাহার কিছু পূর্ব্বে ইলামের অনেক লোক বাবিলন সীমায় রাজ্য করিয়াছিল, এবং বাবিলনের কিঞ্চিৎ ক্ষমতা বিস্তারও করিয়াছিল। বাবিলনের নামজাদা ক্ষমতাশালী রাজা হামুরাবি ২৩০০ অব্দে এবং উহার কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী সময়ে দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে ইলামের লোকদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু ইলামের কোন অংশ অধিকার করিতে অগ্রসর হন নাই।

হামুরাবির সময় হইতে ১৭৮৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত বাবিলনে যথেষ্ট জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছিল, এবং শিল্প ও সাহিত্য যথেষ্ট পুষ্টিলাভ করিয়া-ছিল। এই সময়ের মধ্যে কখন্ যে বাবিলনের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তে, ইলামে, দক্ষিণ সীমাতটে কাশ নামে খ্যাত লোকেরা বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস নাই। এই কাশ-জাতীয়েরা যে ভাষা ব্যবহার করিত তাহা যে ভারতের বেদমন্ত্রে ব্যবহৃত ভাষা ছিল, তাহার অনেক নিদর্শন আছে।

কাশ-জাতীয় লোকেরা ক্ষমতাশালী ছিল বলিয়াই ১৭৮৩ অব্দে

বাবিলন রাজ্য অধিকার করিতে পারিয়াছিল। বাবিলনের সভ্যতা অর্থাৎ বাবিলনের ভাষা, সাহিত্য ও ধর্ম্ম, জেতা কাশ-জাতির ক্ষুদ্র দলটিকে সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়া আপনার করিয়া ফেলিয়াছিল; তথাপি উহাদের ভাষার শতাধিক শব্দ বাবিলনে প্রচলিত হইয়াছিল। বাবিলনে কাশ-রাজবংশের রাজত্ব ৫৭৬ বৎসর। এই সময়ের মধ্যেই আসীরিয়ার রাজাদের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, এবং মিশরের রাজবংশের সহিত বাবিলনের রাজবংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

বাবিলন এবং আসীরিয়ার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণে বিভিন্ন জাতি-সংঘর্ষণেব কথাই মুখ্যতঃ জ্ঞাতব্য। বাবিলনে কাশ-জাতীয় রাজবংশের প্রভুতালাভের ১০০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৮০ অব্দে আসীরিয়দের ক্ষমতালাভের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সময়ে বাবিলন এবং আসীরিয়ার পশ্চিমে খাঁটি বৈদিক-দেবতা-পূজক একটি রাজবংশের ইতিহাস পাওয়া যায়। ইঁহাদের অধিকৃত ভূমির নাম ছিল মিত্তানি এবং কয়েকজন রাজার নাম অর্ত্তম, অর্ত্তষুম, সুতর্ণ এবং দশরথ বলিয়া পাওয়া যায়*। এই মিত্তানির লোকেরা কোন্ সময়ে কি উপায়ে বাবিলন এবং আসীরিয়ার ক্ষমতা-শালী রাজাদের রাজ্য ভেদ করিয়া গিয়াছিল, তাহা সহজবোধ্য নয়। মিত্তানির রাজবংশের একটি কন্যা মিশরের একেশ্বরবাদ-প্রতিষ্ঠাতা ইকৃন-আটন্ বা চতুর্থ আমেন্ হোটেপ্ রাজার মহিষী ছিলেন; হয়-ত বা পত্নীর ধর্ম্মমতবাদের প্রভাবেই রাজার একেশ্বরবাদের জন্ম তৃতীয় আমেন্ হোটেপ্ বাবিলনের কাশরাজবংশের এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

* মিত্তানি শব্দটি সূর্য্য দেবতার মিত্র নামের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে হয়।

১৮৩০—১৮১০ পর্য্যন্ত সময়ের আসীরিয়ায় রাজারা দুইটি নূতন দেবতার নামে মন্দির গড়িয়াছিলেন; এক দেবতার নাম অনু, এবং অন্যের নাম আদদ্। এই সময়ের পরে প্রায় ১৪৯০ অব্দে মিশর-কর্ত্তৃক আসীরিয়া আক্রমণের সময় হইতে ধারাবাহিকভাবেই আসীরিয়ার রাজবংশের এবং রাজকীর্ত্তির ইতিহাস পাওয়া যায়। বাবিলনের কাশ-রাজবংশের সহিত অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহের পর, একজন কাশ-রাজার সহিত আসীরিয়ার রাজকন্যার বিবাহেরও ইতিহাস আছে। কাশ-বংশের রাজত্বের শেষে যখন আকাদ্‌জাতীয় লোকেরা আবার প্রভুত্ব-লাভ করিল, তখন হইতে ক্রমাগতই আসীরিয়ার রাজারা বাবিলন্ রাজ্য বিধ্বস্ত করিতেছিলেন আসীরিয়ার রাজা টিগ্‌লেথ-পাল-অসুর এবং তাঁহার বংশধরেরা প্রায় খৃষ্ট পূর্ব্ব ১১২০ অব্দ হইতে ১০০০ অব্দ পর্য্যন্ত, লোহিতসাগর এবং ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র পশ্চিম দেশে, এবং পূর্ব্বভাগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি স্থানে প্রভাব বিস্তার করিয়া অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; এবং বাবিলনের রাজাদের উপর বহু পরি-মাণে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। বাবিলনের এই অধঃপতনের দিনে আরব অঞ্চল হইতে আগত একটি নূতন দল বাবিলনের দক্ষিণে রাজ্য স্থাপন করিতেছিল, এবং সেই রাজ্যের নাম রাখিয়াছিল কাল্‌দু। কাল্‌দু-বাসী বলিয়া এই জাতীয় লোকেরা কাল্‌দীয় নামে আখ্যাত হইয়াছে।

কাল্‌দু রাজাদের প্রভাবের দিনে সমগ্র পশ্চিম এসিয়ায় বাবিলনের জয়ধ্বজা উড়িয়াছিল এবং পতনের পূর্ব্বাহ্নে গৌরবের দীপ্তি অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়াছিল।

বাবিলনে কাল্‌দীয়গণের আধিপত্যের সময়ে আর্য্য নামে খ্যাত জাতির কয়েকটি শাখা, পশ্চিম এসিয়ায় অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং "মান্দা" নামে প্রসিদ্ধ সিথিয়গণ খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে পতনোন্মুখ

আসীরিয় রাজ্য অধিকার করিয়া নিনেভে নগরটিকে প্রাচীন কীর্ত্তি-স্তম্ভ সহ ধ্বংস করিয়াছিল, এবং ধীরে ধীরে আসীরিয়ার পূর্ণ প্রভুতা লাভ করিয়াছিল।

আসীরিয়ার ক্ষমতা লুপ্ত হইবার পরেও বাবিলনের স্বাধীনতা কিছু দিন অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু সহসা মিডিয়া প্রদেশে এক নব রাজশক্তি বৰ্দ্ধিত হইয়া সমগ্র পশ্চিম এসিয়ায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ৫৫৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ হইতে ৫৩৯ পর্য্যন্ত মিডিয়ার অধিপতি সাইরস, পার্শ বা আদি পারস্য জয় করিয়া আসীরিয়া এবং বাবিলনে প্রভুতা বিস্তার করিয়াছিলেন। আসীরিয়ার সিথিয় মান্দাগণকে পরাভূত করিবার পর, ৫৩৯ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বাবিলনের স্বাধীনতা ধ্বংস হইয়াছিল। এই সাইরসের বংশধর কেম্বাইসেসের পরাক্রমেই ৫২৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মিশর দেশ পারস্যের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।

পাঠকদিগের সুবিধার জন্য সংক্ষেপতঃ বিভিন্ন জাতির ভাগ্যলীলার কথা বলিবার পর, বাবিলন এবং আসীরিয়ার সভ্যতার প্রকৃতির কথা বলিতেছি।

প্রথমতঃ সামুদ্রিক প্রদেশে ৪৫০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দেরও বহু পূর্ব্বে যে সুমেরগণ বর্ণমালা আবিষ্কার করিয়া সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন, যাঁহাদের লিপিকৌশল, ধৰ্ম্ম প্রভৃতি সভ্যতার ফল আহরণ করিয়া আকাদ্ নামে খ্যাত সেমেটিকেরা প্রাচীন ভিত্তির উপর নূতন সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সে জাতির উৎপত্তি এবং সভ্যতার ইতিহাস দুজ্ঞেয় হইয়া রহিয়াছে। সুমের এবং সেমেটিক মিশ্রণে যাঁহাদের অভ্যুদয়, তাঁহাদের নামেই বাবিলনের সভ্যতা কীর্ত্তিত। মিশরে যেমন বৈজ্ঞানিক কৌশলে কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালী কাটিয়া জলসঞ্চয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল, এ দেশেও যে সেই রূপ হইতে পারিয়াছিল সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পরবর্ত্তী যুগে যাঁহারা

বাবিলনের ধ্বংসসাধন করিয়া দেশের ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহারা দেশের এই জল-সঞ্চয়-বিদ্যা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। প্রাচীন কালে বৈজ্ঞানিক কৌশলের প্রভাবে টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিস নদী সংযত ধারায় প্রবাহিত হইত; কিন্তু বিদেশীয়দের অধিকারের পর পয়ঃপ্রণালীর যখন ধ্বংস হইয়া গেল, তখন নদীদ্বয়ের বন্যায় দেশ ভাসিয়া যাইতে লাগিল, এবং যে সামুদ্রিক প্রদেশ স্বাস্থ্যের আবাস ছিল, তাহা জলাভূমিতে পরিণত হইয়া বিবিধ রোগের আকর হইয়া উঠিল।

মিশরের মত বাবিলনেও সুপ্রাচীনকালে জ্যোতির্বিদ্যার অনেক উন্নতি হইয়াছিল। সূর্য্য-চন্দ্রের গ্রহণ গণনা, অনেকগুলি নক্ষত্রের গতিবিধি-নিরূপণ, অদৃশ্য-প্রায় দূরবর্ত্তী গ্রহের পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি, যেরূপ ভাবে পরিচালিত হইত, তাহাতে এ যুগের পণ্ডিতেরা বিস্মিত হয়েন। দূরবর্ত্তী গ্রহের সূক্ষ্ম গণনা দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, যে হয়-ত বা বাবিলনে কোন প্রকার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছিল। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে যে প্রকার সুসজ্জ কাচ ব্যবহার করিবার প্রয়োজন, একটি ভগ্ন স্তূপের মধ্যে সেই শ্রেণীর কাচ আবিষ্কৃত হওয়ায় পণ্ডিতদের অনুমান অমূলক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সময়ের কাল্‌দীয়গণ, পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের উত্তরাধিকারী হইলেও, খাঁটি জ্যোতিষ লইয়া অধিক চর্চ্চা করিতেন না; গ্রহ নক্ষত্রেব গতির সহিত মানবের ভাগ্য-গতি মিলাইয়া ফলিত জ্যোতিষ রচনাতে ইঁহারা ব্যস্ত ছিলেন। স্থপতি-বিদ্যা ও ভাস্কর-বিদ্যা যথেষ্ট ছিল বটে, কিন্তু মিশরের মত এখানে স্থায়ী কীর্ত্তি-স্তম্ভ নাই বলিয়া ভগ্ন মন্দিরের জীর্ণ অংশ লইয়াই বেশির ভাগ উহার বিচার করিতে হয়। বিশালতায় মিশরের পিরামিড অপেক্ষা অত্যন্ত হীন হইলেও, বাবিলনের "জেগুরাৎ" শিল্পসৌন্দর্য্যে কিছু কম ছিল না। প্রাচীন-কালের মূর্ত্তিগুলিতেও উন্নত ভাস্কর-বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়।

রাজা হামুরাবি ২৩০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে রাষ্ট্রশাসনের জন্য যে সকল বিধি রচনা করিয়াছিলেন তাহা কয়েক বৎসর হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ বিধিগুলি দেখিয়াই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে বাবিলন রাজ্য প্রাচীনকালে সর্ব্ববিধ উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

বাণিজ্যের জন্য নদী এবং সমুদ্রে নৌ-চালনা ছিল, কৃষির উন্নতি-সাধনের জন্য রাজকীয় ব্যবস্থা ছিল, দেশরক্ষার জন্য স্থায়ী সৈন্য রক্ষিত হইত, বিচার-কার্য্যের জন্য বাঁধা নিয়ম ছিল এবং বিশেষ বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেন, এবং সর্ব্ববিধ জ্ঞানের চর্চ্চা ও উন্নতির জন্য রাজকোষ উন্মুক্ত ছিল। প্রজারা নিজের ভূমির সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী ছিল; এবং রাজস্ব খুব অধিক দিতে হইত না। রাজকর্ম্মচারীরা বিবাহযোগ্যা পাত্রী-দিগকে একস্থানে উপস্থাপিত করিতেন, এবং সেখান হইতে নির্দ্দিষ্ট পণ দিয়া এবং লিখিত চুক্তিপত্রে দস্তখত করিয়া পুরুষদিগকে স্ত্রী-সংগ্রহ করিতে হইত। কেহ একাধিক পত্নী সংগ্রহ করিতে পারিতেন না; তবে উপযুক্ত কারণে ছাড়পত্র লিখিয়া স্বামী-স্ত্রীর বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিতে পারিতেন। বাবিলনের সভ্যতার আরও কয়েকটি জ্ঞাতব্য কথা আসী-রিয়ার সভ্যতার বর্ণনায় তুলনাযোগে উল্লেখ করিতেছি।

আসীরিয়ার লোকেরা সর্ব্ববিধ বিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক কৌশল বাবিলনের নিকট হইতে ধার করিয়াছিল বলিয়া অধিকাংশ পণ্ডিতের অনুমান। বাবিলনে পাথর পাওয়া যাইত না, কিন্তু আসীরিয়ায় অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাথর বড়ই সুলভ ছিল। আসীরিয়ার মন্দিরগুলির ভগ্নাংশ, প্রস্তরমূর্ত্তি এবং প্রস্তরফলকে খোদিত লিপি, যে বিদ্যা এবং শিল্পের সাক্ষী, তাহা সম্পূর্ণ বাবিলনের নহে। অন্য জীবজন্তুর মুখ অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অথবা মুখ জুড়িয়া যে সকল প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল, বাবিলনে তাহার অনুরূপ কিছুই পাওয়া যায় না। জ্ঞানের

এবং চিত্তবিনোদনের সাহিত্য যে বহুপরিমাণে বাবিলন হইতে গৃহীত, তাহা আসীরিয়ার গ্রন্থভাণ্ডার পরীক্ষা করিয়াই ধরিতে পারা গিয়াছে। আসীরিয়ার অসুররাজগণ বাবিলনের রাজাদের মত মার্জ্জিত-রুচি ছিলেন না; কিন্তু শৌর্য্যে আসীরিয়াবাসিগণ বাবিলনবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ব্যবহারের রূঢ়তা এবং নৃশংসতা দেখিয়া বলিতে পারি, যে অসুর-রাজগণের পরাক্রম এবং ব্যবহার তুল্যরূপে আসুরিক ছিল। বাবিলনের রাজারা যখন বিদেশ জয় করিতেন, তখন তাঁহারা বাবিলনের সভ্যতা দ্বারা বিদেশীয়দিগকে উন্নত করিয়া তুলিতেন এবং যথাসাধ্য আপনার লোক করিয়া তুলিতেন, কদাচ বিজিত রাজ্যের উচ্ছেদসাধন করিতেন না। অসুর-রাজগণ কিন্তু বিদেশ আক্রমণ করিবার পরেই বিজিত দেশকে যতদূর ধ্বংস করিতে পারেন, তাহা করিতেন, এবং বিদেশের নরনারীদিগকে দলে দলে আপনাদের দেশে লইয়া আসিয়া দাস বা শ্রমজীবী করিয়া রাখিতেন, এবং আসীরিয়ার অতিরিক্ত অধিবাসী লইয়া বিজিত দেশে তাহাদের উপনিবেশ রচনা করিয়া দিতেন। যে পরাক্রমে অসুররাজগণ ফিনিসিয়া, সীরিয়া, পেলেষ্টিন প্রভৃতি করতলস্থ করিয়াছিলেন, এবং বিশেষভাবে য়ীহুদাদিগকে পদদলিত করিয়াছিলেন, সে পরাক্রম বহু পরিমাণে পাশব। বাবিলন কখনও স্থায়ীভাবে বিদেশীয়দিগকে পদতলে রাখেন নাই, অথচ বিদেশের নগর এবং পর্ব্বত এখনও বাবিলনের কীর্ত্তির সাক্ষ্য দিতেছে। য়ীহুদাদের অতি মান্য সিনাই পর্ব্বত, বাবিলনের চন্দ্র দেবতার (সিন্) নামে নামাঙ্কিত; সীরিয়া, পেলেষ্টিন এবং আরবের অনেক নগরই বাবিলনের ভাষায় চিহ্নিত। আরবের কাব্বায় যে বহুযুগ-পূজিত প্রস্তর রহিয়াছে, উহাও সম্ভবতঃ বাবিলনের পূর্ব্বকালের ধর্ম্মের ইতিহাস বহন করিতেছে।

খৃষ্টাব্দের ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে মিশরের রাজাদের সহিত

বাবিলনের কাশ-রাজাদের যে প্রকার সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেও সেই সময়কার শান্তি এবং সভ্যতা বিশেষরূপে সূচিত হয়। একজন কাশরাজ একবার মিশরপতিকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই :—"আমি কয়েক মাস পীড়িত ছিলাম; অথচ আশ্চর্য্য এই যে, আপনার কোন দূত এ কয়েক মাস আমার স্বাস্থ্যের কোন সংবাদ লইতে আসে নাই।" পত্র খানির আবদার দেখিয়া উভয় রাজ্যের সৌহার্দ্দ সূচিত হয়, এবং ইহাও মনে হয়, যে দুস্তর মরুভূমির মধ্য দিয়াও সে সময়ে যাতায়াতের নির্ব্বিঘ্ন এবং সুগম পথ প্রস্তুত ছিল। আসীরিয়ার রাজারা কখনও পররাষ্ট্রের সহিত সৌহার্দ্দ করেন নাই; একবাব এক অসুর রাজা একজন কাশরাজকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেটা যে কন্যার সাহায্যে বাবিলন জয়ের উদ্যোগেই হইয়াছিল, তাহা জানা গিয়াছে। পরাক্রান্ত টিগ্‌লেথপল অসুর খৃঃ পূঃ ১০৭৫ অব্দে এবং তাঁহাব আর একজন বংশধর আর একশত বৎসর পরে বাবিলনের যে সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষমার অযোগ্য। উঁহারা বাবিলনের মন্দির এবং কীর্ত্তি অংশতঃ অগ্নিসাৎ এবং অংশতঃ ধূলিসাৎ করিয়া সভ্যতার যে অমূল্য ইতিহাস ধ্বংস করিয়াছিলেন, তাহার জন্য এ কালে আমরা সকলেই শোক করিয়া থাকি। ইহারই প্রতিফল-স্বরূপে যেন খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে মান্দা জাতির বর্ব্বরতার আঘাতে আসীরিয়ায় নিনেভে এবং অসুর-নগর মৃত্তিকাস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। সিথিয় জাতীয়েরা আসীরিয়া ধ্বংস করিয়াছিল, এবং আসীরিয়া, সিথিয়া ও পারস্যের সকল আক্রমণ-কারীরাই পরে পরে বাবিলন ধ্বংস করিয়া চিরস্থায়ী কলঙ্ক অর্জ্জন করিয়াছিল।

এখন বাবিলনের ভগ্নস্তূপ হইতে ইষ্টকলিপির ভগ্নাংশ তুলিয়া সযত্নে যে

ইতিহাস রচিত হইতেছে, উহা লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিত মাস্‌পেরো নিঃশ্বাস ফেলিয়া লিখিয়াছেন যে, বাবিলনের যে ইতিহাস রচিত হইতেছে, উহা ইতিহাসের ভগ্নস্তূপের ক্ষুদ্র এক মুষ্টি ধূলা মাত্র।

ইউরোপে সারাসেন্ সভ্যতা

সারাসেন্ শব্দের মৌলিক অর্থ পূর্ব্বাঞ্চলের লোক; কিন্তু ঐ শব্দে কেবল আরবদেশের অধিবাসীরাই পরিচিত এবং আখ্যাত হইয়া আসিতেছে। ইউরোপে আরবদেশীয় সভ্যতার প্রসারলাভের বিবরণ দিবার পূর্ব্বে, আরব সভ্যতার উৎপত্তি এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে একটু পূর্ব্ব-পীঠিকা দিবার প্রয়োজন। পশ্চিম এসিয়ার যে মরুক্ষেত্রে আরবদেশ অবস্থিত, প্রসঙ্গক্রমে বাবিলনের সভ্যতার কথা বলিবার সময় তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছি; এ প্রবন্ধেও সে বিষয়ের একটু উল্লেখ থাকিবে।

বাবিলনের প্রাচীন গৌরবের যুগে গৌণভাবে আরবের অধিবাসীরা বাবিলনের সভ্যতা অতি অল্প পরিমাণে লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাবিলনের সহিত আরবের কোন পরিচয় হয় নাই। আসীরিয়ার পরাক্রান্ত রাজারা দুই একবার আরবদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কখনও সীরিয়া কিংবা পেলেষ্টিনের মত ঐ দেশটিকে অধিকারভুক্ত করেন নাই। বিস্তৃত মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিস্ অথবা উর্ব্বর ওয়াদিক্ষেত্রে আরবের ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়, বর্ব্বরজনসুলভ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। মিশরের রাজা বা ফেরাওগণ যখন বহুপ্রাচীনকালে সীরিয়া প্রদেশ হইতে খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করিতেন, তখন আরবদেশের বেড্উইন্ দস্যুগণ অনেক উপদ্রব করিত বলিয়া জানা যায়; কিন্তু মিশরের অধিপতিগণ কদাচ মরুবেষ্টিত আরবদেশের পরিচয় লইতে অগ্রসর হয়েন নাই।

পারসিকেরা যখন ক্ষমতার শিখরে উঠিতেছিলেন, তখন প্রথমেই ৫৩৯ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সাইরস্ কর্ত্তৃক বাবিলন রাজ্য বিজিত হইয়াছিল, এবং তাহার পর ৫২৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পারসিক ভূপতি কেম্বাইসেস্ মিশরদেশ জয় করিয়াছিলেন। এই পরাক্রান্ত পারসিকেরাও আরবের মরুপ্রাকার ভেদ করেন নাই। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে যখন মাসিডনের সর্ব্বদিগ্বিজয়ী আলেক্‌জাণ্ডার সমগ্র পশ্চিম এসিয়ায় জয়ধ্বজা উড়াইয়াছিলেন, তখনও আরব-দেশের দস্যুগণ সুবিধাক্রমে তাঁহার অনেক সম্পত্তি লুট করিতে ছাড়ে নাই। আরবের বিরুদ্ধে অভিযান করিবেন বলিয়া আলেক্‌জাণ্ডার যখন মনঃস্থ করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহার মৃত্যু হয়। পরে যখন রোমানেরা ক্ষমতাশালী হইয়া মিশর, পেলেষ্টিন, সীরিয়া প্রভৃতি দেশে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, তখন মেসোপোটেমিয়ার তীরভূমি পর্য্যন্ত পারস্যের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল। পারসিক এবং রোমানেরা যখন পশ্চিম এসিয়া অধিকারের জন্য প্রতি-যোগিতা করিতেছিলেন, তখনও অশিক্ষিত এবং সাহসী আরববাসিগণ মক্কা, মদিনা, তাইফ্ প্রভৃতি নগরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র স্বাধীনরাজ্য রক্ষা করিতেছিল; কেহ তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

মৌলিক জাতির হিসাবে আরবের লোকেরা য়ীহুদাজাতি হইতে অভিন্ন; এবং উভয় জাতিরই ধর্ম্মবিষয়ক প্রাচীন মত এবং ঐতিহ্য এক। বাইবেলের যে পূর্ব্বভাগ প্রাচীনবিধি বা ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট্ নামে পরিচিত, উহা উভয় জাতির মধ্যেই মান্য; তবে নিরক্ষর আরববাসিগণ গ্রন্থের অভাবে প্রাচীন ধর্ম্ম-কাহিনী শ্রুতিরূপে রক্ষা করিতেছিল বলিয়া, য়ীহুদাগণ আরবদেশে রক্ষিত সকল ঐতিহ্য প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। যীশু-প্রচারিত ধর্ম্ম যখন প্রাচীন বিধির উপর নববিধি হইয়া দাঁড়াইল, তখন আরবে উহা উপেক্ষিত হইয়াছিল।

আফ্রিকার আবিসিনিয়ায় খৃষ্টধর্ম্ম গৃহীত হইবার পর, সেখানকার

ভূপতিগণ আরবের দক্ষিণভাগে অস্থায়ী অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং আরবে খৃষ্টধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য বিপুল যুদ্ধের আয়োজন করিয়া মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের নামে এই জৈত্র যাত্রা যে বৎসর নিষ্ফল হইয়া গেল এবং আবিসিনিয়ার সৈন্যেরা মহামারীর প্রাদুর্ভাবে ধ্বংস হইয়া গেল, সেই বৎসর আরবের সৌভাগ্য এবং সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষ মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর এই সময়টি ২০শে আগষ্ট ৫৭০ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। আরব-দেশের লোকেরা নিরক্ষর ছিল, দস্যুবৃত্তি করিত, দেশের ভিন্ন ভিন্ন নগরে প্রতিদ্বন্দ্বী দলপতিগণ আধিপত্য করিতেন, এবং বাইবেলের প্রাচীন-বিধি ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে মান্য ছিল, সে কথা বলিয়াছি। তথাপি হজরৎ মহম্মদের আবির্ভাবকালে দেশের ধর্ম্মবিশ্বাস কিরূপ ছিল, তাহার উল্লেখের প্রয়োজন আছে।

দেশের প্রাকৃতিক গুণেই হউক, আর যাহাই হউক, এই মরুপরিব্যাপ্ত-দেশের অধিবাসীরা আকাশের অসংখ্য তারকা এবং তারাপতি চন্দ্রকে পূজ্য মনে করিত।* তাহা ছাড়া অনেক অশরীরী এবং অগ্নিদেহধারী "জিন্" বা ভূতের প্রভাবও এই দেশে প্রচলিত ছিল।

প্রস্তর মূর্ত্তিতে অনেক উপদেবতা পূজিত হইতেন, এবং মক্কার সুপ্রসিদ্ধ কাব্বা নামক মন্দিরে নর-সৃষ্টির প্রারম্ভকালের একখানি স্বর্গচ্যুত প্রস্তর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেব-নিদর্শন বলিয়া পূজিত হইত। শেষোক্ত প্রস্তরখানি নাকি

N. B.—*Hilprecht প্রভৃতি দক্ষ পণ্ডিতেরা বলেন যে, বাইবেলে উল্লেখ না থাকিলেও প্রাচীন য়াহুদাগণ Lord of the host অর্থে তারকাপুঞ্জের অধিনায়ক চন্দ্রকে পূজা করিতেন; এবং সেই জন্যই সিনাই পর্ব্বতকে Moses দেবতাত্মা মনে করিয়াছিলেন। বলিয়া রাখি যে বাবিলনের ভাষায় Sin অর্থে ছিল চন্দ্র, এবং তাঁহার নামেই পর্ব্বতের নামকরণ হইয়াছিল। প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রভাবেই এখনও মুসলমানের ধ্বজা চন্দ্রকলায় চিহ্নিত এবং নবচন্দ্রের উদয়ের সহিত অনেক পর্ব্বোৎসব গ্রথিত।

আদিযুগে শুভ্র ছিল এবং এখন মানুষের পাপে উহার বর্ণ-মালিন্য ঘটিয়াছে।

মহাপুরুষ মহম্মদের মনোহর পুণ্যময় এবং বহুকীর্ত্তিবহুল জীবনচরিত একটি স্বতন্ত্র দীর্ঘ প্রবন্ধে লিখিলেও প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির পূর্ণ উল্লেখ হয় না; অতি সংক্ষেপে তাঁহার কীর্ত্তির ফলটুকুর কথাই বলিব। ৪০ বৎসর বয়সে ৬১০ খৃষ্টাব্দে তিনি নবধর্ম্মের দ্রষ্টা এবং প্রচারক হয়েন, এবং ৬২২ খৃষ্টাব্দে আরবের নবভাগ্য-প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন। সম্ভবতঃ ৬৩২ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন তারিখে মহাপুরুষ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। যে কৌশলে, প্রভাবে এবং মাহাত্ম্যে তিনি ২২ বৎসর মধ্যে সমগ্র আরবের বহুদেববাদ দূর করিয়া নূতন একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিনায়কত্ব বিনাশ করিয়া আরবে একচ্ছত্র রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন, পাঠকদিগকে তাহা স্বতন্ত্র গ্রন্থে পড়িতে অনুরোধ করি। এত অল্প সময়ের মধ্যে একটি দেশের বহু প্রতিদ্বন্দ্বী-লোকেরা বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া যে দৃঢ়বদ্ধ একতা লাভ করিয়াছিলেন এবং পরাক্রমে প্রতিবেশী সকল জাতিকে তুচ্ছ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা মানব ইতিহাসে অতি অপূর্ব্ব।

যিনি সৈন্যচালনায় এবং প্রদেশজয়ে হজরৎ মহম্মদের প্রধান সহায় ছিলেন, সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ "ওমর", আরবের দ্বিতীয় খালিফ হইয়াছিলেন। খালিফ অর্থ রাজ্যাধিপতি এবং ধর্ম্মগুরু। এ প্রসঙ্গে তেমন প্রয়োজন না থাকিলেও বলিয়া রাখি যে, ভক্ত আবুবেকর দঃ মহম্মদের প্রথম উত্তরাধিকারী খালিফ ছিলেন, এবং দ্বিতীয় খালিফ বীর ওমারের পর ওসমান এবং ওসমানের পর মহম্মদের জামাতা সুপণ্ডিত এবং উদারচেতা আলি, লোকসাধারণ দ্বারা খালিফরূপে নির্ব্বাচিত ও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রভূতক্ষমতাশালী

ওমর ৬৪০ খৃঃ অব্দের মধ্যে সাত বৎসরের সমর-চালনায় পারস্য, মেসোপোটেমিয়া, সীরিয়া, পেলেষ্টিন এবং মিশরদেশ জয় করিয়া ঐ সকল দেশেই নূতন একেশ্বরবাদ বা মুসলমান ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

আবুবেকর হইতে আলি পর্য্যন্ত চারিজন বিশেষ মান্য খালিফের শাসনের অবসানে যে নূতন খালিফবংশের সৃষ্টি হয়, তাহার নাম **ওমিয়ড** খালিফবংশ। এই ওমিয়ড খালিফবংশের দ্বিতীয় খালিফ **ওয়ালিড** ৭০৫ খৃঃ অব্দে **দামাস্কাস্** নগরের নূতন খালিফ-পাটে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ২য় খালিফ ওমারের মত, ওয়ালিডের কীর্ত্তি চিরস্মরণীয়। ইনি একদিকে ভারতের পশ্চিম সীমান্তস্থিত সিন্ধুরাজ্য জয় করিয়া পশ্চিম এসিয়ার সমগ্র পূর্ব্ববিভাগ আত্মশাসনভুক্ত করেন, এবং **মুশা** নামক একজন বীর সেনাপতিকে মিশরের শাসনকর্ত্তা করিয়া তাঁহার নেতৃত্বে আট্‌লাণ্টিক কূল পর্য্যন্ত সমস্ত উত্তর আফ্রিকার রাজ্যগুলি জয় করেন। মুসলমান কর্ত্তৃক ভারতের সিন্ধুজয় ৭০৮ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল। ইহার পর মিশরের শাসনকর্ত্তা মুশার অধীনস্থ সেনাপতি **তারিফ**, খালিফ ওয়ালিডের অনুমতিক্রমে ৭১১ খৃঃ অব্দে ইউরোপের স্পেন দেশের অধিকাংশ ভূভাগ মুসলমানদের অধিকারভুক্ত করেন। আরব সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে এই দু চারিটি কথাই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট। খালিফ ওয়ালিডের সময়ে যে বহু বিস্তীর্ণ ভূভাগ আরব বা সারাসেনদের অধিকারে আসিয়াছিল, কবির ভাষায় তাহার প্রসার বুঝাইয়া বলি—

পশ্চিমে হিস্পানি শেষ,
পূর্ব্বে সিন্ধু হিন্দুদেশ।

তারিফ কর্ত্তৃক বিজিত হইবার পূর্ব্বে স্পেন রাজ্যের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা বলিতেছি। রোমের সমৃদ্ধি এবং গৌরবের দিনে ইউরোপের

অন্যান্য দেশের মত স্পেনরাজ্য, রোম সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। বহু সমৃদ্ধিলাভ করিবার পর রোমানেরা যখন বিলাসপরায়ণ হইয়া মনুষ্যত্ব হারাইতে-ছিলেন, স্পেনের অধিবাসীরাও তখন সেইরূপ নৈতিক অধোগতি লাভ করিতেছিলেন। দেশের কৃষক সাধারণ, হীন দাস বলিয়া বিবেচিত হইত এবং তাহারা ধনী প্রভুদিগকে সর্ব্বস্ব সঁপিয়া দিয়া দারিদ্র্যের পীড়নে নিপীড়িত হইত। মধ্যবিত্ত 'বার্গর' শ্রেণীর লোকেরা দেশের সর্ব্ববিধ ব্যয়ের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা দিতে বাধ্য হইত বলিয়া পদে পদে উৎপীড়িত হইত। সকলকে পদদলিত করিয়া এবং দরিদ্রের রক্তশোষণ করিয়া দেশের ধনী প্রভুগণ বিলাসলীলার অভিনয় করিতেন। মানুষের চরিত্রের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, কুত্রাপি পুরুষোচিত শৌর্য্য দেখা যাইত না এবং স্বার্থপরতার প্রভাবে রাষ্ট্রনীতির গ্রন্থি অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। খৃষ্টোত্তর পঞ্চম শতাব্দীতে রোমরাজ্য যেমন বলশালী বর্ব্বর গথজাতির পদানত হইয়াছিল, স্পেন দেশও তেমনি সেই গথজাতির পাশ্চাত্য-সম্প্রদায়ের শাসনাধীনে আসিয়াছিল। পাশ্চাত্য বা পশ্চিমদেশীয় গথ-দিগের নাম ছিল ভিসিগথ (Visi Goth)। ভিসিগথ বা পাশ্চাত্য গথেরা ধর্ম্মে খৃষ্টিয়ান ছিল বটে, কিন্তু আচরণে নৃশংস বর্ব্বর ছিল। ইহাদের রাজত্বকালে সমগ্র স্পেন দেশ কঠোর দাসত্বের ভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছিল।

গথজাতীয়েরা যখন স্পেনের অধিপতি ছিলেন, তখন আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম কূলস্থিত সিউটা, গথ অধিকারভুক্ত ছিল এবং অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে জুলিয়ান, সিউটার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। জুলিয়ান, তাঁহার অনূঢ়া কন্যা ফ্লরিন্দাকে সুশিক্ষিতা করিবার প্রত্যাশায় স্পেনপতি রডারিকের প্রাসাদে পাঠাইয়াছিলেন। রাজা হইতে প্রজা পর্য্যন্ত ভিসিগথ-জাতীয়েরা যে সে সময়ে সমৃদ্ধিলাভ করিয়া রোমানযুগের প্রাচীন

অধিবাসীদের মতই চরিত্রহীনতায় পশুতুল্য হইয়া উঠিয়াছিল, এ কথা হয়-ত জুলিয়ান্ সুস্পষ্ট জানিতেন না। রাজা রডারিক ধর্ম্মবুদ্ধি-শূন্য এবং চরিত্রনিষ্ঠাবিহীন ছিলেন, তাই দারুণ অধর্ম্ম এবং বিশ্বাসঘাতকতার কর্ম্ম করিয়াছিলেন। বিশ্রদ্ধা শুদ্ধমতি ফ্লরিন্দা যখন কলঙ্কস্পৃষ্টা হইয়া গোপনে জুলিয়ানকে সকল কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তখন জুলিয়ান ক্রোধে আত্মহারা হইয়া প্রতিবেশী মুসলমানদিগকে রডারিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। এই আহ্বানেই তারিফ মুরজাতীয় মস্লেম সৈন্য লইয়া স্পেন জয় করিয়াছিলেন। উত্তর আফ্রিকার 'বের্বের' নামক জাতির সহিত আরবজাতীয় লোকের রক্তসংমিশ্রণে যাহাদের উৎপত্তি, তাহারাই 'মুর' সংজ্ঞায় অভিহিত। স্পেনবিজেতা তারিফ এই বের্বের বা মুরবংশসম্ভূত ছিলেন। আফ্রিকার জাতির নাম করিলেই কৃষ্ণকায় কদাকার নিগ্রোজাতির কথা মনে পড়ে; তাই, বলিয়া রাখিতেছি যে, অমিশ্র বের্বের জাতি কিংবা মিশ্র মুরেরা দেখিতে বেশ সুন্দর। গাছের ভাল কলম করিবার এই একটি পদ্ধতি আছে, যে খুব উৎকৃষ্ট ফলের গাছের "চোক কলম" কাটিয়া একটি খুব জীবন্ত ও বলিষ্ঠ জংলী গাছের গায়ে বসাইতে হয় এবং তাহা হইলেই অতি উৎকৃষ্ট কলমের গাছ পাওয়া যায়। জীবন্ত এবং ক্ষমতাদৃপ্ত বের্বেরগণ আরব সভ্যতার রক্ত লাভ করিয়া শারীরিক এবং মানসিক বলে বলিষ্ঠ হইয়াছিল। আরবেরা প্রায় শত বর্ষের সাধনায় সর্ব্ববিধ সুশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছিল। সমগ্র এসিয়ায় এবং মিশরে মস্লেম প্রভুতা বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া, মিশর, গ্রীস এবং পারস্যের উন্নত জ্ঞান এবং শিল্প-বিদ্যা সারাসেন্দিগের অঙ্গীভূত হইয়াছিল। পারসিক এবং গ্রীকদের স্থাপত্য এবং ভাস্কর-বিদ্যা এক সঙ্গে মিলাইয়া যে নূতন সারাসেন্ শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছিল, এ যুগেও এ জগতে তাহা অতুল্য। আমাদের আগ্রার তাজমহল এই সারাসেন্ শিল্পের মনোহর

দৃষ্টান্ত। খালিফ ওয়ালিদের সময় (৭০৫ খৃষ্টাব্দে) সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, নৌচালনা, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি এত উন্নত হইয়াছিল, যে ইউ-রোপীয় দক্ষ ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, যদি ঐ সময়ে সারাসেনেরা কনস্তান্তিনোপল্ অধিকার করিতে পারিতেন, তাহা হইলে সমগ্র ইউরোপে খৃষ্ট ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে মস্‌লেম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইত। জ্ঞানের হিসাবে ইউরোপ খণ্ড যে তখন অর্দ্ধ বর্ব্বর ছিল, এ কথা কেহ অস্বীকার করেন না।

মুরেরা যখন সারাসেন্ সভ্যতা লইয়া স্পেনরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন বর্ব্বরতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা অপসারিত করিয়া সুতন্ত্রিত সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হইল বলিয়া ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন। রোমান রাজ্যের এবং আদিযুগের খৃষ্টান রাজ্যের কৃষকপ্রমুখ শ্রমজীবিগণ, ভূম্যধিকারী-দের দাসমাত্র ছিল; কোন সম্পত্তিতে এই দাসদের অধিকার ছিল না; এই জন্যই সমাজের যথার্থ স্তম্ভস্বরূপ নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এক রাজার পর অন্য রাজার অধিকারভুক্ত হইলেও কিছুমাত্র ব্যস্ত বা দুঃখিত হইত না। মুসলমান অধিকারে সমস্ত নিম্নশ্রেণীর লোকের দাসত্ব ঘুচিয়া গিয়াছিল। হজরত মহম্মদের অনুশাসন এই, যে ব্যক্তি দাসের প্রতি নিষ্ঠুরতা করিবে অথবা তাহার উন্নতিতে বাধা দিবে সে কদাচ স্বর্গে যাইতে পারিবে না। *মুসলমানরাজ্যে একদিন যে দাস, সে অন্যদিন সম্রাট্ পর্য্যন্ত হইতে পারে; ইতিহাসে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। স্পেনের কৃষকেরা মস্‌লেমদের নব বিধানে আপনার আপনার ভূমির

* মহম্মদের অনুশাসনটি উল্লেখ করিয়া মুরজাতির ইতিহাসলেখক S. Lane-Poole লিখিয়াছেন :—Slavery is a very mild and humane institution in the hands of a good Mahomedan. ......A man who ill-treats his slave will not enter into Paradise.

স্বত্বাধিকারী হইয়াছিল এবং ইচ্ছা করিলেই তাহারা আপন আপন ভূমি দান বিক্রয় প্রভৃতি দ্বারা হস্তান্তর করিতে পারিত। এ ব্যবস্থাও হইয়াছিল যে মুসলমান হইলেই দাসের দাসত্বের শেষ চিহ্নটুকুও নষ্ট হইয়া যাইবে। কাজেই দেশের নিম্নশ্রেণীর সকল লোকেরাই যথার্থতঃ রাজভক্ত হইল এবং অনেকে ইচ্ছাপূর্ব্বক মস্লেমধর্ম্ম গ্রহণ করিল। বার্গর বা মধ্য-শ্রেণীর লোকেরাও প্রভুদের খামখেয়ালীর উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইয়া নির্ভয়ে আপনাদের গৃহে ধন এবং সুখ সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিল। ভূমিবিধি, দণ্ডবিধি, শাসনবিধি প্রভৃতি খৃষ্টিয়ান্-মস্লেম অভেদে প্রযুক্ত হইত এবং কাহাকেও স্বাধীন ধর্ম্মমত পোষণের জন্য বা প্রচারের জন্য তিলমাত্র বিড়ম্বিত হইতে হইত না। রাজ্যশাসন এবং প্রজা-রক্ষার এই নীতি ইউরোপখণ্ডে এই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

স্পেনরাজ্যের মস্লেম শাসনকর্ত্তা আবদর রহমান অষ্টম শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে ফরাসী রাজ্য অধিকাব করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন।

ফরাসী দেশের সে সময়ের কথঞ্চিৎ সভ্য অধিবাসীরা স্পেনের খৃষ্টিয়ান-দের মত বর্ব্বর যুগের বলিষ্ঠতা হারাইয়া, নির্বীর্য্য হয় নাই; ফ্রাঙ্ক সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক চার্লস্ মার্টেল (অর্থাৎ গদাঘাতদক্ষ চার্লস) বিশেষ শৌর্য্যে এবং পরাক্রমে ফরাসীদেশ হইতে চিরদিনের মত মুসলমান আক্রমণ দূরীভূত করিয়াছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসীদেশের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শারলেমেন্ একবার স্পেনজয়ের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। এই সময় হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত স্পেনরাজ্যে অক্ষুণ্ণ মোস্লেম শাসন চলিয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের মোস্লেম অধিপতিগণ কি ভাবে এবং কত দিন রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, এবং মোস্লেম রাজ্যের আত্ম-বিদ্রোহে কিরূপভাবে স্পেনরাজ্যে এবং

অন্যত্র শাসন-বিপ্লব ঘটিয়াছিল, সে বিবরণ এ প্রবন্ধে প্রদত্ত হইতে পারে না। মুসলমান রাজত্বের যুগে স্পেন দেশে কিরূপ সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাক্ষাৎ এবং পরোক্ষভাবে ইউরোপের সভ্যতাকে উজ্জীবিত করিয়াছিল, স্থূলভাবে সেই কথাই কিছু কিছু বলিব।

খালিফের শাসনকর্ত্তাদ্বারা শাসিত না হইয়া যখন স্পেন রাজ্যে স্বতন্ত্র সুলতানের রাজত্ব আরব্ধ হইয়াছিল, তখন হইতেই বহুবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। প্রথম সুলতান আব্দর রহমানের সময় হইতে সুলতান হাকামের রাজত্ব-কাল পর্য্যন্ত সময়, ন্যায়শাসন এবং জ্ঞান-চর্চ্চার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। দলে দলে সুপণ্ডিত এবং কলাবিদ্যায় পারদর্শিগণ পারস্য এবং আরব প্রভৃতি স্থান হইতে নব মুসলমান রাজ্যে আসিয়া প্রতিভার পুরস্কার লাভ করিতেছিলেন। ৮২২ খৃষ্টাব্দে হাকামের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় আব্দর রহমানের সময়ে অনেক পণ্ডিত এবং শিল্প-কুশলী, সুলতানের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বিবিধ বিভাগের জ্ঞানচর্চ্চা এবং ধর্ম্মশাস্ত্রচর্চ্চা ত চলিতেছিলই, তাহা ছাড়া নৃত্য-গীত প্রভৃতির চর্চ্চা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে দেশের সর্ব্বত্রই সঙ্গীতাদি আদৃত হইতেছিল। প্রাচীন সময়ের অর্দ্ধ বর্ব্বরদের সৌন্দর্য্যানুভূতি একটু অতি মাত্রায় বাড়িয়াছিল মনে হয়। সুলতানের একজন লঘুচেতা সভাসদ্, পরিচ্ছদ পরিবার, কেশ বিন্যাস করিবার এবং কথা কহিবার রীতি সম্বন্ধে যে পদ্ধতিটি আদর্শ বলিয়া প্রচার করিতেন, তাহাই দেশের সর্ব্ব-সাধারণ লোকে অনুকরণ করিত। স্পেন দেশে পূর্ব্বে কেবল ধাতুপাত্রই ব্যবহৃত হইত; সারাসেনেরা কাচের ব্যবহার প্রচলিত করিয়াছিল; এবং কাচের ভোজন ও পান-পাত্র, দীপদান এবং আয়না প্রভৃতি ইউরোপখণ্ডের মধ্যে স্পেনদেশেই প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল। বিবিধ সুস্বাদু ব্যঞ্জন রঁধিবার রীতিও সারাসেন্ পাচকেরা প্রথমে শিখাইয়াছিল।

মুসলমানশাসনের সে সময়ে সকলেই সুখে শান্তিতে বাস করিতেছিল; কিন্তু এক শ্রেণীর খৃষ্টিয়ান্ সম্প্রদায়ের কাছে এই শান্তি অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মচর্চ্চায়, মুসলমানেরা বাধা দিত না বলিয়া কোন খৃষ্টিয়ান, ধর্ম্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখাইয়া বাহাদুরী লাভ করিতে পারে নাই। জোর করিয়া "মার্টার" সাজিবার জন্য অর্থাৎ কোন প্রকারে একটা ছুতা খুঁজিয়া ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য প্রাণত্যাগ করিবার গৌরব লাভ করিবার প্রত্যাশায় কয়েক জন পুরুষ এবং রমণী উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিনা কারণে এবং অযাচিত ভাবে সুলতানের মন্ত্রী কিংবা কাজির সমক্ষে উপস্থিত হইয়া কয়েকজন পুরুষ এবং রমণী চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, মুসলমানধর্ম্ম মিথ্যা, মহম্মদ চোর এবং কোরাণের ব্যবস্থা নারকীয়। মন্ত্রী এবং কাজিগণ এই উন্মাদদিগকে অনেক বুঝাইয়া ঐ সকল কথা উচ্চারণ করিতে নিষেধ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সেই সাধু ব্যবহারে আরও উত্তেজিত হইয়া মুসলমান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এমন সকল কথা বলিতে লাগিলেন যাহাতে প্রাণ-দণ্ডের নিশ্চিত ব্যবস্থা ছিল। কেহ কেহ বা কারাগারে রুদ্ধ হইবার পর উদ্‌ভ্রান্তভাব পরিহার করিয়াছিলেন, কিন্তু কয়েকজন একেবারে না মরিয়া ছাড়েন নাই। সে যুগের খৃষ্টিয়ানদের পক্ষে পরবাদসহনীয়তা অসহ্য ছিল।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কৌতুকাবহ কথা বলিতেছি। মুসলমানেরা প্রতিদিন যত্নপূর্ব্বক মুখ ধুইত এবং দাঁত পরিষ্কার করিত, হাত পা না ধুইয়া মস্‌জিদে নেমাজ পড়িত না এবং আহারের পর সর্ব্বদাই মুখ ধুইত; যাহা কিছু মুসলমানেরা করিত তাহারই উল্টা অনুষ্ঠান করিতে হইবে বলিয়া এই সকল পরিচ্ছন্নতার বিরুদ্ধেও কয়েকজন পুরুষ পাদ্রী এবং চির-কুমারী উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। মনের পরিচ্ছন্নতাই যে আসল পরিচ্ছন্নতা, এ কথা কেহ অস্বীকার না করিলেও ঐ ভাল কথাটির ধুয়া

ধরিয়া অনেক খৃষ্টিয়ান, জলসংযোগের পরিচ্ছন্নতা জিদ্ করিয়া পরিহার করিয়াছিলেন। একজন ধর্ম্মপ্রাণা বৃদ্ধা খৃষ্টিয়ান নারী স্পর্দ্ধার সহিত মুসলমান মৌলবীদিগকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি ৬০ বৎসর ধরিয়া দাঁত পরিষ্কার করেন নাই কিংবা গায়ে জল দেন নাই। স্পেনদেশে খৃষ্টিয়ান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হইবার পর, ইংলণ্ডের রাণী মেরীর স্বামী ফিলিপ, কর্ডোভা নগরের বহুসংখ্যক স্নানাগার মুসলমান কুসংস্কারের চিহ্ন মনে করিয়া একেবারে ধ্বংস করিয়াছিলেন। খৃষ্টিয়ানদের এই বিদ্বেষ পঞ্চদশ শতাব্দীতে কি আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা মস্লেম রাজত্বের অবসানের বিবরণে স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞাতব্য।

সারাসেন প্রভাবে, স্পেনদেশে সর্ব্ববিধজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল এবং জ্ঞানপিপাসায় যে কর্ডোভা নগরে ইউরোপ খণ্ডের অনেক লোক শিক্ষার্থী হইয়া আসিতেন, ইউরোপের ইতিহাসে তাহার উল্লেখ আছে। চিকিৎসা-বিদ্যা, উদ্ভিদ-বিদ্যা, ভূবিদ্যা, জ্যোতিষ, রসায়ন এবং প্রাকৃত-বিজ্ঞান প্রভৃতি যখন এদেশে বিশেষ উন্নত হইয়াছিল তখন ইউরোপের অন্যত্র অজ্ঞানতার অন্ধকার ছিল বলিয়া একালের ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন। সে সময়ে কিরূপ মনোহর হর্ম্ম্য রচিত হইয়াছিল তাহা বুঝাইয়া বলা অসম্ভব হইলেও একটুখানি বিবরণ দিবার চেষ্টা করিতেছি। এ যুগের উন্নত এবং সুশিক্ষিত ইংরেজ ঐতিহাসিক "লেন-পুলের" একটু মন্তব্য পাদটীকায় উদ্ধৃত করিলাম। * উহার সংক্ষিপ্ত

N. B. * When we remember that the sketch we are about to extract..................concerning the glories of Cordova, relate to the tenth century, when our Saxon ancestors dwelt in wooden holves and trod upon dirty straw, when our language was unformed, and such accomplishments as reading and writing were almost confined to a few monks, we can to some extent realize the extraordinary

মর্ম্ম এই :—দশম খৃষ্টাব্দীতে যখন ইউরোপের অধিবাসীরা জ্ঞানে এবং ব্যবহারে বর্ব্বর ছিল এবং লোকেরা কাঠের ক্ষুদ্র কুঁড়ে ঘরে মলিনভাবে বাস করিত, সেই সময়ে স্পেন দেশে মস্লেম সভ্যতার অতি আশ্চর্য্য উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। হর্ম্ম্যাদির গৌরবের আভাস দিবার পূর্ব্বে আর একটি কথার উল্লেখ করিতেছি। সুলতানেরা যে সকল রমণীয় উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন সেগুলি একাধারে তাঁহাদের সৌন্দর্য্যানুভূতির এবং বৈজ্ঞানিক উন্নতির সাক্ষী। পৃথিবীর যে স্থানে যে রমণীয় বৃক্ষলতা বা সুস্বাদু ফলের গাছ পাওয়া যাইত তাহা স্পেনদেশে আনিয়া সুকৌশলে বাড়ান হইয়াছিল।

প্রথম সুলতান আবদর রহমনের সময়ে যে রমণীয় মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এখনও কর্ডোভানগরে তাহা লুপ্ত হয় নাই। কর্ডোভানগরে ধনী ব্যক্তিদের ৫০,০০০ সুনির্ম্মিত হর্ম্ম্য ছিল, সাধারণ লোকের লক্ষাধিক আবাসগৃহ ছিল, ৭০০ মস্জিদ বা উপাসনালয় ছিল এবং সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ৯০০ স্নানাগার ছিল। কর্ডোভানগরের নিকটে নদীর উপর যে মনোহর এবং দৃঢ়নির্ম্মিত সেতু রচিত হইয়াছিল আজিও তাহা সুরক্ষিত রহিয়াছে। ৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সুলতান আবদর রহমনের সময়ে যে মস্জিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল উহা এখনও ইউরোপে শ্রেষ্ঠ মন্দির বলিয়া স্বীকৃত। এই মস্জিদটি বহুপ্রসারিত খিলানে নির্ম্মিত এবং উহার ১২৯৩টি স্তম্ভ এখনও সৌন্দর্য্যে মনোহর হইয়া রহিয়াছে; উহার কারুকার্য্যের বর্ণনা করা অসম্ভব; এবং যে সকল বহুমূল্য ধাতু এবং

civilization of the Moors. And when it is further recollected that all Europe was then plunged in barbaric ignorance and savage manners........................the wonderful contrast afforded by the capital of Andalusia (স্পেন) will be better appreciated.

প্রস্তরে ঐ মস্‌জিদ ভূষিত হইয়াছিল, অংশতঃ তাহা ইতিহাসেই পড়িতে হয়। রাত্রিকালে উপাসনার সময়ে অনেক ঝাড় লণ্ঠন ত জ্বলিতই, তাহা ছাড়া মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে যে মোমের বাতিটি দিবারাত্র জ্বালাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইত সেটির ওজন পঁচিশ সের হইত। মস্‌জিদের মেঝে এবং দেওয়ালে যে সকল সুমার্জ্জিত মার্ব্বল প্রভৃতি পাথর বসান হইয়াছিল এখনও তাহার উজ্জ্বলতা দেখিয়া লোকে চমৎকৃত হয়।

কর্ডোভার উপকণ্ঠে একটি উপনগর বসাইয়া, তৃতীয় আবদর রহমন তাঁহার পত্নী এজ্‌-জেহারার (তিলোত্তমা) নামাঙ্কিত করিয়া যে প্রাসাদ গড়িয়াছিলেন তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিয়াই একালের লোক স্তম্ভিত এবং বিস্মিত হয়। যাহা সৌন্দর্য্যে অতুল্য ছিল, তাহাও ধ্বংস করিতে যাহাদের প্রাণে বাধে নাই, সেই রূঢ় ব্যক্তিদের বংশধরেরা এখন এজ্‌-জেহারার একটি অংশ কারাগার রূপে ব্যবহার করিতেছেন। সুলতানের এই প্রাসাদটি যে ৪,০০০ স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেগুলি বহুদেশ হইতে আনীত দুর্লভ প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্তম্ভের সংখ্যাতেই প্রসার সূচিত হয় বটে, তবুও ইহা উল্লেখযোগ্য যে এই প্রাসাদের প্রবেশদ্বার, সংখ্যায় ১৫,০০০ ছিল। প্রাসাদের মধ্য-ভাগের হল বা দালানটির কেন্দ্রস্থলে একটি নাতিবৃহৎ সরোবর প্রস্তুত করিয়া, সেই সরোবরটি পারদে পরিপূর্ণ রাখা হইত। উজ্জ্বল ধাতু এবং মণি-মুক্তা-খচিত গৃহে যখন আলোক পড়িত, তখন সে আলোক, পারদ এবং মণি মুক্তায় প্রতিফলিত হইয়া যে দীপ্তি-বিকাশ করিত, বহুদুর হইতেও তাহার প্রভা অতি পরিস্ফুটভাবে লক্ষিত হইত। প্রাসাদের চারিদিকের উদ্যান এবং কৃত্রিম নির্ঝরগুলির শোভার বর্ণনায় এক একজন ঐতিহাসিক এক এক অধ্যায়ই লিখিয়াছেন।

সারাসেন্‌ সভ্যতায় উদ্‌বুদ্ধ মুরদের জ্ঞান-চর্চ্চার কথা পূর্ব্বেই

বলিয়াছি। তবুও সুলতান হাকামের পাঠাগারের একটু উল্লেখ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। যে যুগে পুস্তক ছাপিবার জন্য মুদ্রা-যন্ত্র ছিল না তখন সুলতানের পাঠাগার চারি লক্ষ গ্রন্থে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। দেশ বিদেশ হইতে বিভিন্ন বিদ্যার গ্রন্থ, বহুমূল্যে ক্রয় করিয়া অথবা বহু ব্যয়ে নকল করাইয়া আনা হইত; এবং কোন কবি নূতন কাব্য রচনা করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন শুনিলেই, সুলতান সেই কবিকে বহু অর্থ দান করিয়া বিদেশ হইতে আনাইয়া তাঁহার রচিত গ্রন্থের প্রথম সংখ্যাখানি পাঠাগারে রাখিতেন। পাঠাগারের অধিকাংশ গ্রন্থই সুলতান নিজে পাঠ করিতেন এবং গ্রন্থের পার্শ্বে পাণ্ডিত্য-জ্ঞাপক টীকা লিখিতেন। গ্রন্থগুলি তাঁহার টীকায় অমূল্য হইয়াছিল একথা অনেক আরবী ভাষায় লিখিত হইয়াছে। মস্লেম-প্রভাবে উৎপন্ন বলিয়া খৃষ্টিয়ান উত্তরাধিকারিগণ ঐ সকল গ্রন্থ অপাঠ্য এবং পরিত্যজ্য বোধে অপসারিত করিয়াছেন। সারাসেন্ সভ্যতার কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি স্পেনদেশে বিলুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে বটে, কিন্তু মুরদের প্রভাবে যে জ্ঞান এবং কৌশল উদ্ভাসিত হইয়াছিল, একালের ইউরোপীয় সভ্যতার প্রথম স্তর, সেই জ্ঞান ও কৌশলের মহিমায় রচিত।

তুরস্ক রাজ্যের উৎপত্তি

যাঁহারা যবন-মণ্ডলে জয়ধ্বজা উড়াইয়া, মাসিডনিয়া, থেসালি প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত রাজ্যটিকে, আপনাদের প্রাচীন মাতৃভূমির নামে তুরস্ক আখ্যা দিয়াছিলেন, তাঁহাদের উৎপত্তির আদি ইতিহাস অতি সংক্ষেপেই বিবৃত হইতেছে।

পারস্য রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্ব হইতে মহাচীনের পশ্চিম উপকণ্ঠ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ, বীরদস্যুর আবাস বলিয়া বিখ্যাত। অতি প্রাচীন কাল হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, বহু শ্রেণীর নর-পঙ্গপাল এই ভূভাগ হইতে অগ্রসর হইয়া মহাচীন ইউরোপ এবং ভারতের শস্য-সমৃদ্ধক্ষেত্র অনেক-বার উজাড় করিয়াছে। তাতারের মোঙ্গল এবং তুর্কীস্থানের তুরাণি মহাচীনের ভাষায় হিয়াংনু নামে অভিহিত। 'হিয়াংনু'-অর্থ বর্ব্বর-দস্যু। হিয়াংনুর গতিরোধের জন্যই খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে, মহাচীনের প্রসিদ্ধ প্রাচীর বেষ্টনের সৃষ্টি হয়। খৃষ্টোত্তর পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর তুরাণ-ইরাণ সংঘর্ষের বিবরণ লইয়া, 'শানামে' নামক মহাকাব্য রচিত। ঐ কাব্যের অতি করুণ সোরাব-রোস্তাম কাহিনীর সহিত সকল পাঠকই হয়-ত সুপরিচিত। অতি পূর্ব্বকালে তুরাণি বা তুর্কীরা কি ধর্ম্ম পালন করিত তাহা সুস্পষ্ট জানা যায় না। কিন্তু খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতেই উহারা বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছিল, এবং অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রধানতঃ সেই ধর্ম্মই পালন করিতেছিল। মহাপুরুষ মহম্মদের আবির্ভাবের পর নব-ধর্ম্ম-দীক্ষিত আরবীয়েরা যখন সিন্ধু-সীমান্ত পর্য্যন্ত মস্‌লেম-গৌরব প্রসারিত

করেন, তখন তুর্কীস্থানের বীর অধিবাসীরাও কোরাণ-প্রচারিত নবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তুর্কীরা বীর, তাহার উপর ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধ করিতে বড় দক্ষ ছিল। আমাদের দেশে অশ্বারোহী সৈন্যের নামই হইয়াছে তুরক্ সোয়ার। সিন্ধু হইতে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত মস্‌লেম রাজ্যের অধিনায়কেরা সামরিক সাহায্যের জন্য বহু সংখ্যক তুরাণি বা তুর্কীদিগকে আদর করিয়া দেশে বসাইয়াছিলেন। সামরিক সাহায্যের জন্য মস্‌লেম পুরুষেরা যাঁহাদের গুণগান করিতেন, রমণীরা দর্শনমাত্রে তাঁহাদের রূপে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছিলেন। এই জন্যই অনেক তুরাণি ক্রীতদাস পর্য্যন্ত দেখিতে দেখিতে রাজ-জামাতা হইয়া প্রভুত্ব-লাভ করিতে পারিতেন। যাঁহাদের ভাগ্যে এতখানি সুবিধা ঘটিয়াছিল, তাঁহারা যে আরবের খাঁটি খালিফদের প্রভাব-ক্ষয়ের দিনে, সমগ্র দেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া উঠিবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি! দ্বাদশ শতাব্দীতে সেলজুক তুর্কগণই মস্‌লেমরাজ্যের এসিয়াখণ্ডে অধীশ্বর হইয়াছিলেন এবং মিশরের মাম্‌লুকেরাও তুর্কবংশোদ্ভব ছিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে, তুর্কীদের বড় একটা নূতন দল, তাতারের মোগলদের তাড়নায়, তুর্কীস্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ খোরাসানে, এবং তাহার পর টাইগ্রিস্ নদীর তীরে স্বগোত্রীয় সেলজুক-শাসিত রাজ্যে উদ্বিগ্নভাবে বাস করিতেছিল। এই নবাগত তুর্কদলের নায়ক ছিলেন এর্‌টোগ্রাল্। ইনিই ইউরোপীয় তুরস্ক রাজ্যের আদি পুরুষ। একদিন সেই সময়ের মস্‌লেম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর কাইকোবাদ্, তাতারের চিঙ্গিজ্ খাঁর প্রেরিত মোগল সৈন্য কর্ত্তৃক এঙ্গোরা নামক যুদ্ধক্ষেত্রে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। এর্‌টোগ্রাল ঠিক সেই সময়ে বিনা উদ্দেশ্যে আপনার সৈন্যদল চালাইয়া স্থানান্তরে যাইবার উদ্‌যোগ করিতে-

ছিলেন। এঙ্গোরাক্ষেত্রে যুদ্ধ বাধিয়াছে দেখিয়া এর্‌টোগ্রাল যুদ্ধ করিতে উৎসাহী হইলেন। কে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতেছে জানিতেন না; ঠিক যেন দৈব তাড়নায় তিনি কাইকোবাদের পক্ষ লইয়া, মোগল-শত্রুকে পরাজিত এবং বিধ্বস্ত করিলেন। যুদ্ধজয়ের পর কাইকোবাদ্ তাঁহার অযাচিত সাহায্য-দাতাকে কৃতজ্ঞচিত্তে এসিয়া-মাইনরের এনাটলিয়া রাজ্য দান করিয়াছিলেন। এই হইল যবন-মণ্ডলীতে নব তুরস্করাজ্য-সৃষ্টির প্রথম ভিত্তি। এই নব-লব্ধরাজ্যে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে সাগাদ্ নামক স্থানে এর্‌টোগ্রালের বংশপ্রদীপ ওস্‌মান্ বা ওৎমান্ জন্মগ্রহণ করেন। ইক্ষ্বাকু আদি পুরুষ হইলেও রঘুর নামেই যেমন কোশলরাজগণ পরিচিত, তেমনই এই ওস্‌মান, তুরস্কের সুলতানগণের গোত্র-প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন। খাঁটি ওস্‌মানের বংশধরেরাই অথবা এর্‌োটোগ্রালের সন্তানেরাই, আজ পর্য্যন্ত ছত্রিশ পুরুষ ধরিয়া রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। ওস্‌মান শব্দ হইতেই তুরস্ক সাম্রাজ্যের নাম হইয়াছে Ottoman Empire।

ওৎমান্ বা ওস্‌মানের বীরকীর্ত্তি এবং প্রেম-কাহিনী তুল্যরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এর্‌টোগ্রাল স্বীয় ভুজবলে এবং পুত্র ওস্‌মানের সাহায্যে অনেক প্রতিবেশী জাতিকে শাসনাধীনে আনিয়া, সুতন্ত্রিত রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এসিয়া-মাইনরের প্রান্তে গ্রীক সম্প্রদায়ের লোকেরাও স্বজাতীয় শাসন অপেক্ষা এই নূতন শাসন অধিকতর মঙ্গলপ্রদ মনে করিয়াছিলেন। যুবক ওস্‌মান যখন পিতৃনিদেশে দেশ-জয়ের উদ্‌যোগ করিতেছিলেন, তখন একদিন ইৎবুরুনি গ্রামে পণ্ডিত এদ্‌বালির অনূঢ়া কন্যার প্রেমমুগ্ধ হয়েন। মৌলবী সাহেবের সুন্দরী কন্যাটির দুইটি নাম ছিল—এক নাম কামায়ুয়া বা ইন্দুপ্রভা এবং অন্য নাম মালখাতুন বা সম্পদ্দাত্রী লক্ষ্মী। ওস্‌মান্ ইন্দুপ্রভার জ্যোৎস্নাজালে বাঁধা পড়িয়া তাহাকে ভাগ্য-লক্ষ্মী করিবার জন্য এদ্‌বালির নিকট আবেদন করিলেন;

কিন্তু এদ্‌বালি প্রথমে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। তাহার পর একদিন ওস্‌মান্‌ এদ্‌বালিকে তাঁহার এই অপূর্ব্ব স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিলেন যে,—ওস্‌মান্‌ নিদ্রাযোগে অনুভব করিয়াছিলেন, যে এদ্‌বালির বক্ষোদেশ হইতে একটি চন্দ্র উদ্ভূত হইয়া ওস্‌মানের ক্রোড় আশ্রয় করিল এবং তাহার পরে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ জন্মিয়া, চারিদিকে এমন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিল যে উত্তরে ডানিউব নদী, পূর্ব্বে টাইগ্রিস্‌ ইউফ্রেটিস্‌, এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে নাইন নদী বৃক্ষের ছায়ায় পড়িয়া, তাহার মূলদেশে জলসেচন করিতে লাগিল, এবং সেই ছায়া-মণ্ডপতলে যবন-রাজ্যের প্রাচ্য রাজধানী কনস্তান্তিনোপল, অত্যুজ্জ্বল হীরকাঙ্গুরীয়ের মত শোভা পাইতে লাগিল। ওস্‌মানের অঙ্কলক্ষ্মী সেই হীরকাঙ্গুরীয় পরিবার জন্য যাই অঙ্গুলি বাড়াইলেন, অমনি নাকি ওস্‌মানের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এদ্‌বালি এই স্বপ্নের কথা শুনিয়া, ভবিষ্যৎ মসলেমরাজ্য-প্রসারের স্বপ্নে বিভোর হইলেন, এবং "এ চাঁদ তোমারই" বলিয়া ইন্দুপ্রভা বা ভাগ্যলক্ষ্মীকে ওস্‌মান্‌ বা ওৎমানকে সম্প্রদান করিলেন।

ওস্‌মান্‌ বাহুবলে যখন এসিয়ার অন্তর্ভুক্ত সমগ্র গ্রীক-রাজ্য অধিকার করিয়া বস্ফরাস্‌-কূলে জয়পতাকা উড়াইলেন, তখন ইউরোপের খৃষ্টান-সঙ্ঘ, মুসলমানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত ছিলেন। ইহার অনেক পূর্ব্বেই 'ক্রুসেড্‌' নামক জৈত্রযাত্রায় ইউরোপীয়েরা দলে দলে পরাস্ত হইয়াছিলেন, এবং মিশরের মাম্‌লুকদের হস্তে ফরাসীপতি সেণ্ট্‌লুই বন্দী হইয়াছিলেন। বাইজাণ্টাইন্‌ রাজ্যও তখন পতনোন্মুখ হইয়াছিল; কাজেই তুর্ক-বিজয়ের বিরুদ্ধে কেহ দাঁড়াইতে পারে নাই। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি তখন নূতন নীতিতে আত্মরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত করিতে ব্যস্ত ছিলেন।

ওস্‌মান যখন ব্রুসা প্রভৃতি দখল করিলেন, তখন তাঁহাকে ছলে

বন্দী করিবার জন্য গ্রীকেরা এক ফাঁদ পাতিয়াছিলেন; একটি বিবাহ সভায় সৈন্য সাজাইয়া রাখিয়া ওস্‌মানকে সেখানে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। চতুর ওস্‌মান সকল অভিসন্ধিই বুঝিতে পারিয়াছিলেন ও তিনি ৪০ জন যোদ্ধাকে নারী সাজাইয়া প্রথমতঃ বিবাহ সভায় পাঠাইয়াছিলন, এবং তাহার পর তিনি নিজে উপস্থিত হইলে গ্রীকেরা তাঁহাকে বন্দী করিবার উদ্যোগ করিবামাত্রই তাঁহার প্রচ্ছন্ন সৈন্যেরা গ্রীকদিগকে পদদলিত করিল। ওস্‌মান ঐ গ্রীক বিবাহের কন্যাটিকেও সংগ্রহ করিলেন, এবং তাহাকে পুত্রবধূ করিলেন। এই গ্রীক রমণীর নাম ছিল নেনুফার অর্থাৎ ফুল্ল সরোজিনী। ওস্‌মানের পুত্র ওরখাঁ এবং গ্রীক যুবতী সরোজিনী যে পুত্র লাভ করেন তিনি ওরখাঁর রাজত্বের পরে প্রথম মুরাদ নামে মবলব্ধ রাজ্যের সুলতান হইয়াছিলেন। এর্‌টোগ্রালের রাজ্য-জয়, ওস্‌মানের বিবাহ এবং পুত্রবধূ সংগ্রহ অনেক কবির কাব্যের মনোহর উপাদান হইয়াছে। বঙ্গদেশেও ঐ আখ্যান-বস্তু লইয়া অনেক কাব্য লেখা চলে। যদিও ওস্‌মানের রাজত্বকালে বল্‌কান্ উপদ্বীপ এবং কনস্তান্তিনোপল তুর্ক-অধিকারভুক্ত হয় নাই, তবুও ওস্‌মানই, বংশ-প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রথম সুলতান নামে অভিহিত হয়েন। কনস্তান্তিনোপলের প্রাসাদে এখনও ওস্‌মানের তরবারি রক্ষিত হইতেছে, এবং সুলতানের গদিতে অভিষেকের সময়ে সকল নূতন সুলতানকেই সেই তরবারি স্পর্শ করিতে হয়।

ওস্‌মানের পুত্র ওরখাঁ সর্ব্ব প্রথমে বল্‌কান্ উপদ্বীপে অর্থাৎ ইউরোপে বিজয়ী সেনা চালনা করেন, এবং তাহার পর প্রথম মুরাদ বল্‌কান্ রাজ্যে কসোভাক্ষেত্রে ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে সার্ভিয়া, বোস্‌নিয়া, হাঙ্গারী, ওয়ালাচিয়া প্রভৃতি রাজ্যের মিলিত সৈন্যবলকে পরাস্ত করিয়া, বল্‌কান্ রাজ্য অধিকার করেন।

ইহার পর মুরাদের পুত্র বাইজিদ্, নিকপলির যুদ্ধক্ষেত্রে, ফরাসী এবং জার্ম্মাণ-সৈন্যবাহিনী-পুষ্ট হাঙ্গারীর অধিপতিকে পরাজিত করিয়া রাজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করেন। এই সময় হইতে ১৪৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তুরস্কের সুলতানদিগকে ক্রমাগতই উত্তর প্রদেশের খ্রীষ্টিয়ান্ বলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এই যুদ্ধের সময়ে যে সকল নিষ্ঠুরতা আচরিত হইয়াছিল, দুই একটি কথার পরেই পাঠকদিগকে তাহার পরিচয় দিতেছি।

১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদের সময়ে ওস্মানের স্বপ্নলব্ধ হীরকাঙ্গুরীয় যথার্থই তুরস্কের রাজ্যলক্ষীর অঙ্গুলির অলঙ্কার হইল। প্রভুত কৌশলে এবং বীরত্বে ঐ বৎসর কনস্তান্তিনোপল্ অধিকৃত হইয়াছিল, এবং অষ্ট্রীয়া ও জার্ম্মাণ রাজ্যের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত সমস্ত বলকান্ উপদ্বীপ তুরস্ক-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এই ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ইউরোপের ইতিহাসে নবযুগ গণিত হইয়া থাকে।

তুরস্কের সুলতানেরা কিরূপে ধীরে ধীরে, পারস্যের সীমান্তে বাগ্দাদ পর্য্যন্ত খালিফ্দের প্রাচীন রাজ্য সম্পূর্ণ করগত করিয়াছিলেন, সেই ইতিহাস, ইতিহাসে পড়া ভাল। এখানে কেবল একটি বিশেষ জয়ের কথা বলিতেছি। পারসিকদিগকে পরাজিত করিবার পর এবং পেলেষ্টিন্ প্রভৃতি অধিকার করিবার পর সুলতান সেলিম ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে মিশরের মাম্লুকদিগকে অটোমান-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। মিশরের মাম্লুক বংশীয় অধিনায়কেরা এই সময়ে মস্লেম-গুরুপাটের অধিকারী হইয়া খালিফরূপে সম্মানিত হইতেছিলেন; এবং হজরৎ মহম্মদের পরিধেয় বসন প্রভৃতির রক্ষক ছিলেন। সুলতান সেলিম মিশর জয়ের পর কেইরো নগরে পরাজিত মাম্লুক সুলতানের হস্ত হইতে মস্লেমধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতি-নিদর্শনগুলি প্রাপ্ত হয়েন। এই কারণে এই সময়

হইতে তুরস্কের সুলতানগণ মুসলমানদের খালিফ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছেন।

ওস্‌মানের কথায় একবার উল্লেখ করিয়াছি যে, বিজিত গ্রীক প্রজাবৃন্দ অখৃষ্টিয়ান শাসন বরণ করিয়া অধিকতর সুখে ছিল। যুদ্ধে নিষ্ঠুরতার অভিনয় এই যুগে সকল জাতির মধ্যেই দেখা যাইত। তুরস্কের নববলকে পরাজিত করিবার জন্য হাঙ্গারীর বীর হানিয়াদি বহুতর খৃষ্টিয়ান রাজ্যের সৈন্য-সাহায্যে একবার যখন ১৪৪২ খৃষ্টাব্দে সহস্রাধিক তুরস্ক-সৈন্যকে বন্দী করিয়াছিলেন, তখন যেরূপ নির্ম্মমভাবে বন্দীদিগকে চক্ষুর সমক্ষে হত্যা করাইতেছিলেন, এবং মুমূর্ষুর কাতর আর্ত্তনাদে উৎফুল্ল হইয়া মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিতেছিলেন, তাহা কোনও কল্পিত রাক্ষস বা পিশাচের গল্পেও শোভা পায় না। অষ্ট্রীয়া এবং হাঙ্গারীর রক্তমাংস হইতে এই পৈশাচিক ভাব যে একেবারে দূর হয় নাই, তাহা একালের মহাসমরের সংবাদে কখনও কখনও অনুভব করা যাইতেছে। ওস্‌মান এবং তাঁহার বংশধরেরা যেরূপভাবে সৈন্যবল সংগ্রহ করিয়া দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিলেন, তাহার একটু পরিচয় দিবার প্রয়োজন। বহুসংখ্যক গ্রীকজাতীয় খৃষ্টিয়ান্ বালক সংগ্রহ করিয়া, তাহাদিগকে মুসলমান ধর্ম্মে এবং মুসলমানি শিক্ষায় বাড়াইয়া তুলিয়া পরাক্রান্ত জেনিসারি নামক সৈন্যবল রচিত হইত। তুর্কী সৈন্যের পক্ষে বিদ্রোহী হইবার ভয় ছিল; কিন্তু যাহারা অনাথ এবং সুলতানদের কৃপায় পুষ্ট, তাহারা কদাচ অভক্ত হইত না। যুদ্ধের সময় লুট-তরাজ করিয়া যাহা পাইত তাহাও তাহারা উপভোগ করিতে পারিত। জেনিসারি ব্যতীতও অন্য অনেক শ্রেণীর সৈন্য ছিল; তাহাদের মধ্যে পিয়াদা এবং সিপাহি দলের কথা বলিব। তুরস্কের সমর-বিভাগের ঐ শব্দ দুইটি আমাদের ভাষায়ও ব্যবহৃত হইতেছে। চাকরান জমি দিয়া স্থায়ী

পিয়াদা সৈন্যের সৃষ্টি করা হইয়াছিল; এবং ভিন্ন জাতীয় লোক লইয়া সিপাহিদলের সৃষ্টি হইয়াছিল। একটা বড়-রকম স্থায়ী সৈন্যবল সেই সময়ে অন্যত্র কোথাও রক্ষিত হয় নাই। রণতরী-চালনাতেও সে সময়ে তুরস্ক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, এবং উহার বলেই ভেনিস প্রভৃতি রাজ্যকে সুলতানেরা মাথা তুলিতে দেন নাই।

চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত তুরস্কের সুলতানেরা কেবলই জয়লাভ করিয়াছিলেন, এবং ইউরোপীয়দের নিকট অপরাজেয় বলিয়া বিবেচিত হইতেন। ক্রমাগত জয়লাভ হয়-ত বা মানুষের বা জাতির মঙ্গলের কারণ হয় না। অংশতঃ বিজিত এবং শঙ্কিত ইউরোপীয়েরা কলঙ্কক্ষালনের জন্য অবিরত চেষ্টা করিয়া নূতন কৌশল এবং নূতন বল উদ্ভাবন করিতেছিলেন; কিন্তু তুরস্ক, গৌরবের মোহে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন; যে বল লইয়া যুদ্ধ করিয়া, তুরস্কের জয়লাভ হইয়াছিল, তাহাব যে হীনতা বা দুর্ব্বলতা থাকিতে পারে, একথা সুলতানেরা আপনাদের অহঙ্কারে ভাবিতেও পারেন নাই; যত উদ্যোগ করিলেও যাহারা হটিয়া যায়, তাহাদের কল-কৌশল বা নীতি যে অনুকরণীয় অথবা শিক্ষাপ্রদ, একথা গৌরব-দৃপ্ত তুবস্ক কদাচ মনে স্থান দিতে পারেন নাই। প্রাচীন গৌরব লইয়া যাহারা মোহের স্বপ্ন সৃষ্টি করে, তাহাদের পতন অনিবার্য্য। "এই সকল রীতি-নীতি লইয়াই ত পূর্ব্বপুরুষের লোকেরা উন্নতির শিখরে উঠিয়াছিলেন, তবে ইহা আমাদের উন্নতির বাধা হইবে কেন?" ইহাই হইল পতিতের মরণ-কালের কুবুদ্ধি-প্রণোদিত যুক্তি। ইউরোপ যখন উন্নতির শিখরে উঠিতেছিল, তুরস্ক তখন ধাপে ধাপে নামিয়া যাইতেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ইউরোপীয়েরা তুরস্কের নাড়ী টিপিয়া বুঝিয়াছিলেন, যে উহার দুর্ব্বলতার একশেষ হইয়াছে। ইচ্ছা করিলেই

ইউরোপখণ্ড হইতে তুরস্ক-রাজ্যকে দূর করা যাইতে পারে, একথা বহু-পূর্ব্বেই ইউরোপীয় ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্বার্থের খাতিরেই যে তুরস্ককে স্থানচ্যুত হইতে হয় নাই, ইহাও ইতিহাসে পড়িয়া থাকি। রুষিয়ার জার নিকোলাস, তুরস্ককে Sickman বা রুগ্ন বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

মুরেরা যেরূপ সম্পূর্ণরূপে সারাসেন্ সভ্যতায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, নব তুরস্করাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারা সেরূপ হয়েন নাই। তাঁহারা মস্‌লেমধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, মস্‌লেম প্রভাবে বহু পরিমাণে জাতীয় রূঢ়তাও মন্দীভূত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সারাসেনদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি পূর্ণভাবে আপনার করিয়া লইতে পারেন নাই। এই জন্য স্পেনের মত তুরস্কে আরবীয় জ্ঞান-প্রণোদিত কীর্ত্তি অধিক স্থাপিত হইতে পারে নাই। তুরস্ক সাহিত্যের প্রথম যুগে যে সকল কবিতা রচিত হইতেছিল, তাহা পারসিক সাহিত্যের অনুকরণ মাত্র; উহাতে কিছুমাত্র নূতনত্ব ছিল না। তুরস্ক-সাহিত্যের কয়েক জন প্রধান কবি বাগ্দাদবাসী ছিলেন। সাহিত্যে কিছু নূতনত্বের সৃষ্টি করা দূরে থাকুক, প্রাচীন ধরণের সাহিত্য রচনাতেও তুরস্কের খ্যাতি হয় নাই। পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে ক্ষমতার শিখরে উঠিয়া তুরস্ক যখন ইউরোপীয়দিগকে শঙ্কিত রাখিয়াছিল, তখন ইংলণ্ডে এবং ফ্রান্সে মনোহর সাহিত্য রচিত হইতেছিল; কিন্তু তুরস্কে কিছুই হয় নাই। জ্ঞানের অনুশীলনে এবং বিবিধ কৌশলের উদ্ভাবনে ইউরোপীয়েরা এখন কত উন্নত তাহা সকলেই জানি; আশ্চর্য্য এই, এত উন্নতি এবং এত আলোকের নিকটবর্ত্তী থাকিয়াও তুরস্কবাসীরা অনুন্নত এবং অন্ধকার-মগ্ন রহিয়াছে।

চীনজাতীয় সভ্যতা

তাতার, তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, জাপান এবং ভারতের পূর্ব্ব-উপদ্বীপ নামে খ্যাত ভূখণ্ড যাহাদের আবাস-ভূমি, তাহারা মোঙ্গলজাতি নামে আখ্যাত। অঙ্গের পীতবর্ণ, আকৃতির খর্ব্বতা, চক্ষুর ঈষৎ মুদ্রিতভাব, শ্মশ্রু-গুম্ফের বিরলতা এবং নাসিকার অনুচ্চতা, সমগ্র মোঙ্গলজাতির বিশেষত্ব। ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি পূর্ব্বউপদ্বীপের অধিবাসীদের শরীরে অংশতঃ ভারতবাসীর রক্ত আছে বলিয়া উহারা কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ; কিন্তু তবুও তাহাদের শরীরে মোঙ্গললক্ষণগুলি অতি সুস্পষ্ট। আমরা দার্জ্জিলিং প্রভৃতি স্থানে মোঙ্গলজাতীয় ভুটিয়াদিগকে দেখিতে পাই। অতি প্রাচীন কাল হইতেই হিমালয়ের পূর্ব্বভাগে মোঙ্গলজাতির লোকদের সহিত ভারতবাসীরা পরিচিত হইয়া আসিয়াছেন। মোঙ্গলাধ্যুষিত পার্ব্বত্যদেশকেই প্রথমতঃ আমাদের পিতৃপুরুষেরা চীনদেশ আখ্যা দিয়াছিলেন, ও এই প্রবন্ধে যে দেশের সভ্যতার কথা লিখিতেছি, উহা মহাচীন নামে আখ্যাত হইয়াছিল।

হিমালয়ের অপর পারে তিব্বত মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি লইয়া চীন রাজ্যের প্রসার অতি অধিক ; দেশটি আয়তনে ইউরোপ অপেক্ষা বৃহৎ এবং ইউরোপ অপেক্ষা এ দেশের লোক সংখ্যা অনেক অধিক। এ দেশের লোকেরা স্মরণাতীত প্রাচীন কালে বাবিলনের আকাদ্‌দের সভ্যতা লইয়া সভ্য হইয়াছিল বলিয়া কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করিয়া থাকেন, কিন্তু সে অনুমানের কোন দৃঢ় ভিত্তি পাওয়া যায় নাই। চীন

দেশের প্রবাদেতিহাসে দেশের প্রাচীনতা সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়া থাকে, সে প্রাচীনতার তুলনায় মিশর এবং বাবিলনের সভ্যতা, অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইয়া পড়ে। যাহা প্রবাদ মাত্র, তাহার উপর পূর্ণ আস্থা-স্থাপন করা চলে না; তবে খৃষ্টাব্দের ২০০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে যাহাদের খাঁটি ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাদের প্রাচীনতা, বাবিলনের প্রাচীনতা অপেক্ষা অল্পবয়স্ক বলিতে সাহস হয় না। সকল "আদি"ই যখন অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন, তখন চীন দেশে আদি যুগের অন্ধকার উদ্ভিন্ন হইল না বলিয়া দুঃখ নাই; এখনও ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা, চীন দেশের যথার্থ বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই বলিয়া, এ দেশের সুরক্ষিত ইতিহাসের সহিতও আমাদের পরিচয় হইতেছে না। এইটি যথার্থ দুঃখের কথা।

চীনদেশীয় সভ্যতার একটি বিশেষ প্রকৃতি এই যে, দেশের লোকেরা প্রাচীনকালে কদাপি যুদ্ধ করিয়া দেশ জয় করে নাই; ধীরে ধীরে প্রতিবেশীদিগকে আপনাদের রাজ্যের সুশাসন এবং শান্তির দৃষ্টান্তে মুগ্ধ করিয়া আপনাদের দেশভুক্ত করিয়া লইয়াছিল, এবং যথাসম্ভব এক-জাতীয়ত্ব স্থাপন করিয়াছিল। এই প্রথাতেই পীত নদী হইতে আরম্ভ করিয়া হুয়াংহো এবং ইয়াংসিকিয়াং পর্য্যন্ত ভূভাগ বহু প্রাচীনকালে এক-দেশরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। অন্য দেশের লোকেরা দস্যুবৃত্তির অনুসরণে বা রাষ্ট্র-জয়-কামনায় যাহাতে এই বিস্তৃত সাম্রাজ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার জন্য কোন প্রকার স্থায়ী সামরিক উদ্যোগ হয় নাই; জনস্রোত বা দস্যুস্রোত রোধ করিবার জন্য সমগ্র রাজ্য ব্যাপিয়া যে প্রাচীর-বেষ্টন রচিত হইয়াছিল, তাহা উচ্চতায়, বিস্তারে এবং দৈর্ঘ্যে এত বড়, যে এ কালের অতি সভ্যজাতীয় লোকেরাও উহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া থাকেন। বিনা যুদ্ধে দেশের প্রসার বাড়াইয়া এবং সম্পূর্ণরূপে

অন্যদেশ এবং জাতির লোকের সহিত কিছুমাত্র পরিচিত না হইয়া, যাহারা স্মরণাতীতকাল হইতে খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত খাঁটি স্বদেশী সভ্যতায় বাড়িয়া উঠিয়াছিল এবং পরবর্ত্তী যুগেও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে আসিয়া, যাহারা ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোন দেশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে নাই, তাহাদের সভ্যতার প্রকৃতি বিশেষভাবে নূতন হইবারই কথা।

একেত ইহাদের সভ্যতার প্রকৃতি নূতন বলিয়া সহসা বিদেশীয়েরা চীনের রীতি-নীতির মর্ম্ম-গ্রহণ করিতে পারে না, তাহার উপর আবার ইহাদের সাহিত্য আয়ত্ত করা কঠোর হইতেও কঠোরতর ব্যাপার। অন্ততঃ দেশের ৪,০০০ বৎসরের যে সাহিত্য এবং ইতিহাস, চীনভাষায় লিখিত আছে, তাহা পড়িবার উদ্যোগ করিতে হইলে ৫,০০০ অক্ষর আয়ত্ত করিতে হয়। ইহাদের প্রতি অক্ষরকে না কি এক একটি শব্দ বলিলেও চলে। সাধারণতঃ ৪,০০০ অক্ষর লিখিয়া লইতে পারিলেই ব্যবহারিক কার্য্যাদি মোটামুটি চালাইতে পারা যায়। আর্য্য-লিপিতে বাম হইতে ডাহিনে লিখিয়া যাইবার নিয়ম এবং সেমেটিক-লিপিতে ডাহিন হইতে বামে লিখিয়া যাওয়াই রীতি। চীন দেশে ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে অক্ষর লিখিয়া যাইতে হয় এবং এক ছত্রের পর অন্য ছত্র ডাইন হইতে বাঁয়ের দিকে লিখিবার রীতি। লিখিবার প্রথা এবং অক্ষরের প্রতিকৃতি দেখিয়া মনে হয় যে ৪।৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে অন্য কোন জাতির অক্ষর ধার না করিয়াই চীনবাসীরা লিপি-কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিল; উদ্ভাবনী-শক্তিতে যে ইহারা অত্যন্ত বড়, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। গ্রন্থাদি ছাপিবার জন্য চীনেরা যে যুগে মুদ্রা-যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সে যুগে এ কালের অনেক সভ্য জাতি লিখিতেও শিখে নাই। বন্দুক এবং বারুদের সৃষ্টি ইহাদের প্রথম; কিন্তু সামরিক উদ্যোগ নাই বলিয়া, উহার কোন উন্নতি সাধন হয় নাই।

যাহারা অন্যের সংস্পর্শে আসে নাই, আপনাদের চিন্তা এবং কর্ম্ম লইয়াই বাড়িয়া উঠিয়াছে, প্রয়োজনের সমস্ত সামগ্রীই যাহারা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আপনাদের দেশে পাইয়াছে, বিপুল যুদ্ধের আয়োজনে যাহাদের দেশে রাষ্ট্রবিপ্লবের পর রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে নাই, তাহারা যে উন্নতির নামে নূতন পরিবর্ত্তনের বিরোধী হইবে এবং রক্ষণশীল হইয়া প্রাচীনতা-কেই অক্ষুণ্ণ রাখিতে যাইবে, তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। চীনদেশের বর্ত্তমান সময়ের সমাজে স্মরণাতীত যুগের রীতি-নীতি যেমন রক্ষিত আছে, এমন আর কুত্রাপি নাই। কাজেই একবার উহাদিগকে চিনিয়া ও বুঝিয়া লইতে পারিলেই অতি প্রাচীন এবং আধুনিক যুগের সভ্যতার কথা সুস্পষ্ট হইতে পারে। এই চীনজাতির পরিবর্ত্তন-সহনীয়তা এত অল্প, যে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন কন্‌ফিউসস সর্ব্ববিধ সুনীতির প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশটিকে তাৎকালিক বিলাসজনিত হীনতা এবং অন্যবিধ নীচত্ব এবং পশুত্ব হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে পদে পদে পূর্ব্বকালের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য দেখাইয়া আপনার মত প্রচার করিতে হইয়াছিল। কন্‌ফিউসস্-প্রচারিত নীতি-সমুচ্চয়ের সহিত বুদ্ধদেব-প্রচারিত ধর্ম্মের বিরোধ দেখা যায় নাই বলিয়াই হয়-ত বা বৌদ্ধধর্ম্ম চীনদেশে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল। যদিও চীনের প্রচলিত রীতি-নীতি এবং বিশ্বাসের ভিত্তিতেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত অথবা পরি-বর্ত্তিত আকারে গৃহীত, তথাপি কি কারণে ভারতের মহাপুরুষ এবং তাঁহার শিষ্যগণ চীনদেশে পূজিত এবং সম্মানিত হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা এখনও দুর্ব্বোধ্য রহিয়াছে।

যে বিশিষ্ট মতবাদের উপর চীনদেশের ধর্ম্ম এবং সমাজ প্রতিষ্ঠিত, তাহার একটু উল্লেখ করিতেছি; কারণ ঐটুকু ছাড়িয়া দিলে চীনের সভ্যতার কোন কথাই বুঝিতে পারা যাইবে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের

উপাদান কদাচ একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে সৃষ্ট হইয়াছিল, এ কথা চীনেরা অন্ততঃ ৪,০০০ বৎসরের মধ্যে কখনও স্বীকার করে নাই। কিছু-না হইতে কিছুর উৎপত্তি, কল্পনার অতীত ভ্রান্ত বিশ্বাস বলিয়া উপহসিত হয়; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান চিরদিনই রহিয়াছে এবং পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিতেছে, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস; ৪,০০০ বৎসর পূর্ব্বের বিবরণ হইতে পাওয়া গিয়াছে যে, এখনকার মত সেকালেও দেশের লোকে বিশ্বাস করিত যে ব্রহ্মাণ্ডের উপকরণরাশির মধ্যে দুইটি ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে যথা,—একটি সূক্ষ্ম পুরুষশক্তি এবং আর একটি অক্ষম জড়তাযুক্ত প্রকৃতি। এই পুরুষ-প্রকৃতি-মিশ্রণেই বিশ্ব উদ্ভূত হইতেছে। কপিলের সাংখ্যমত, খাঁটি আর্য্যের জিনিষ নহে বলিয়া বৈদিক ঐতিহ্য হইতে ধরিয়া লইতে হয়। যে প্রভাবে কপিলের মতের জন্ম, তাহার সহিত চীনের সম্পর্ক আছে কিনা, কে বলিতে পারে? সর্ব্ব উপাদানের বীজস্বরূপ যে তা বা খিয়্ নাম পাওয়া যায় এবং যাঁহার নামে তিয়ান্‌সান্ পর্ব্বত নামাঙ্কিত, সেই তা ঠিক ঈশ্বর নহেন; কতকটা নির্গুণ ব্রহ্মের মত মনে হয়।

যাহা অজ্ঞেয়, অদৃশ্য এবং কল্পনাতীত, তাহা লইয়া চীনদেশের লোকেরা মাথা ঘামায় না; এইজন্য যাহা কিছু মানুষের প্রয়োজনে লাগিতে পারে, তাহারই তত্ত্ব লইয়া চীনদেশের লোকেরা চিরকাল ব্যস্ত। আকাশে জ্যোতিষ্কপুঞ্জ, মানুষের ভাগ্যকে নিয়মিত করে মনে করিয়া গ্রহ-নক্ষত্রাদির আলোচনা হইয়াছে, গ্রহণ-গণনা হইয়াছে এবং মোটামুটি জ্যোতিষ-শাস্ত্র বেশ পুষ্টিলাভ করিয়াছে। গৃহের উপাদানের জন্য এবং ঔষধের জন্য ভূতত্ত্ব এবং উদ্ভিদ্‌বিদ্যা সযত্নে আলোচিত হইয়াছে; এবং খৃষ্ট পূর্ব্ব ২০০০ সংবৎসরেও বহুবিধ বিজ্ঞান-চর্চ্চার আভাস পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের খাতিরেই বিজ্ঞানের অনুসন্ধান হয় নাই বলিয়া এবং প্রয়োজনের

জিনিষ একবার পাইলেই তৃপ্তিলাভ হইয়াছে বলিয়া, কোন দিকের অনুসন্ধানই অধিকদূর পর্য্যন্ত যায় নাই। ব্যবহারের পদার্থ প্রস্তুত করিতে, ঘর-বাড়ী গড়িতে, নানাবিধ অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিতে, ইহারা এত দক্ষতা দেখাইয়া থাকে, যে শিল্পচাতুরীতে কোন জাতির লোক ইহাদিগকে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। বঙ্গদেশেও আমরা চীনেমিস্ত্রির দক্ষতার পরিচয় পাইয়া থাকি।

প্রাচীনকালে দেশে কোন সামরিক উদ্যোগ হয় নাই বলিয়া বীরত্বের কাহিনী লইয়া কোন সাহিত্য রচিত হয় নাই; কাজেই আমরা যাহাকে মহাকাব্য বলি, চীন-সাহিত্যে তাহার জন্ম হয় নাই। চিন্তা এবং ভাব অতীন্দ্রিয়ের রাজ্যের দিকে প্রসারিত হয় নাই বলিয়া, ভাব-প্রধান আদর্শ-কাব্য রচিত হয় নাই,—আদর্শ গড়িতে গিয়া কেহ কখনও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির প্রয়াস পায় নাই। ক্ষণিক চিত্তবিনোদনের জন্য যে গল্প বা কবিতা রচিত হইয়াছে বা হয়, তাহা তৃপ্তিকর নহে বলিয়া শুনিতে পাই। খাঁটি লোক-ব্যবহারের কথা লইয়া হাসি-তামাসা এবং কৌতুক-নাট্য রচিত হইয়া থাকে, এবং উহার অভিনয়ই যথেষ্ট আনন্দপ্রদ বিবেচিত হয়। যাহা হউক চীন-সাহিত্য এখনও সুপঠিত নহে বলিয়া অধিক মন্তব্য লেখা উচিত নহে।

ব্রহ্মাণ্ড-বিকাশের মূলে পুরুষ-প্রকৃতির অচ্ছেদ্য যোগ আছে বলিয়া, পারিবারিক বন্ধনের জন্য বিবাহানুষ্ঠান অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়; এবং সাধারণ নিয়মে সকল পুরুষ-নারীকেই বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইতে হয়; বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে চিরকুমার সন্ন্যাসীর সৃষ্টি হইয়াছে সত্য, কিন্তু বিবাহ, মানুষের মুক্তির বাধা বলিয়া কল্পিত হয় নাই। বহু-বিবাহ বিষয়ে নিষেধ-বিধি না থাকিলেও গুরুতর বিশেষ কারণ না থাকিলে, কোন পুরুষ একাধিক পত্নী গ্রহণ করেন না। গৃহকর্ম্মের

প্রয়োজনের জন্য বিবাহিতা এবং অবিবাহিতা রমণীরা গৃহের বাহিরে নানা-স্থানে যাতায়াত করিতে পারেন, কিন্তু গৃহপ্রাঙ্গণই রমণীদের ন্যায্য বিচরণ-ক্ষেত্র। ঠিক অবরোধ প্রথাটি না থাকিলেও কোন রমণী অপরিচিত পুরুষের সহিত কথা কহিতে পারেন না এবং পুরুষ-রমণী একসঙ্গে মিলিয়া কোন প্রকার সামাজিকতা করিতে পারেন না। ইউরোপীয়দের বিচারে চীন-রমণীরা সন্তান-পালনাদির ভারে অত্যন্ত পীড়িতা। সম্মানিত বংশে রমণীদিগকে কঠিন জুতা পরিয়া পা ছোট করিতে হয় বলিয়া, ইহারা দ্রুত যাতায়াতে বিশেষ অপটু; রমণীদের এই অক্ষমতা-নিবন্ধন মন্থরগতি মনোহারিণী বলিয়া বিবেচিত হয়।

ধর্ম্মতত্ত্বের মূল বিশ্বাসের কথা বলিয়াছি। দেশের মন্দিরে মন্দিরে অনেক দেবতা দেখিয়া মনে হইতে পারে যে, ঐ দেবতাবর্গ মোক্ষধর্ম্ম-সাধনার জন্য প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। ভূত-পিশাচাদিতে এ দেশের লোকের বিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল: এবং উহাদের উৎপাত নিবারণ করিবার জন্য অনেক তন্ত্র, মন্ত্র এবং মন্দিরের সৃষ্টি হইয়াছে। মন্ত্রপূত করিয়া বিবিধ বর্ণের পাতাকা উড়াইলে, ভূতের উৎপাত থাকে না মনে করিয়া ইহারা অনেক স্থলেই অনেকগুলি পতাকা তুলিয়া দেয়। দার্জ্জিলিং অঞ্চলের ভুটিয়াদের মধ্যেও আমরা এই রীতি দেখিতে পাই।

রাজবংশের লোকেরা, আদি দেব তা বা থিয় হইতে উৎপন্ন মনে করিয়া দেশের লোকেরা রাজা বা সম্রাটকে সেদিন পর্য্যন্ত দেবতার মত পূজা করিয়া আসিতেছিল। এক রাজার অনুজ্ঞাই দেশ-শাসনে মান্য এবং প্রতিপাল্য হইয়া আসিতেছিল এবং রাজা বা সম্রাটেরা দেবসন্তান বলিয়া সাধারণ লোকের চক্ষুর সমক্ষে উপস্থিত হইতেন না। রাজকর্ম্মচারীরা বাঁধা আইনে বিচার-কার্য্যাদি চালাইতে বাধ্য ছিলেন, কিন্তু সম্রাটেরা

আপনাদের ইচ্ছামতই দণ্ড-বিধানাদি করিতেন। অল্পদিন পূর্ব্বের রাষ্ট্র-বিপ্লবে প্রাচীন শাসন-নীতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং এই বিংশ শতাব্দী হইতে চীনদেশে নবযুগ-প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইয়াছে। প্রজাবৃন্দ সম্রাট-দের সম্পূর্ণ অধীনস্থ দাস মাত্র, এই ভাবটি সর্ব্বদা স্বীকার করিয়া স্মরণ রাখিবার জন্য সকলকেই দীর্ঘবেণী রাখিতে হইত; রাষ্ট্রবিপ্লবের পর এই দাসত্বের চিহ্নরূপ বেণী ছেদন করিয়া সকলেই আপনাদের ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছে।

আর্য্য সভ্যতার প্রাচীনতা

প্রাচীনতম বেদমন্ত্রে যে সভ্যতা কথঞ্চিৎ অভিব্যক্ত মাত্র, কত দিনে এবং কি প্রকারে ভারতবর্ষে উহার বিকাশ হইয়াছিল, তাহা এখনও পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায় নাই। এক সময়ে কয়েকজন ইউরোপীয় পণ্ডিত সাহস করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে রচিত প্রাচীনতম বেদমন্ত্রগুলি খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৫০০ হইতে ১০০০ সংবৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু বৈদিক ভাষা এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন তথ্যের আবিষ্কারের পর হইতে কেহ আর প্রাচীন বেদমন্ত্রগুলিকে অত অল্পবয়স্ক মনে করেন না। ডাক্তার ব্লুমফিল্ড নূতন আবিষ্কারগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষের বৈদিক সভ্যতাকে খৃষ্ট পূর্ব্ব ২০০০ সংবৎসরে পিছাইয়া লইলেও সুসঙ্গতভাবে সময় নির্দ্দেশ করা হয় না। পণ্ডিতটি অনেক আলোচনার পর কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া লিখিয়াছিলেন যে, বৈদিক সভ্যতা যে কত প্রাচীন, তাহা এখনও জানা যায় নাই বলিলেই ভাল হয়। ঐ কথাটি ডাক্তার ব্লুমফিল্ড যে ভাবে তাঁহার "বৈদিক ধর্ম্ম" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তাহা পাদটীকায় উদ্ধৃত করিলাম।

এত দিনের গবেষণায়ও কিছু জানিতে পারা গেল না, ইহা লজ্জার কথা বটে; কিন্তু গোঁজামিল দিয়া একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করা অপেক্ষা সত্যকথা স্বীকার করায় অধিক মাহাত্ম্য আছে।

It is truly humiliating to students of ancient India to have to answer the inevitable question as to the age of the Veda with a meek "We don't know."

যাঁহারা কেবলমাত্র ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত, কদাচ তাঁহাদের দ্বারা প্রাচীন যুগের সভ্যতার বয়স নিরূপিত হইতে পারিবে না। ভাষাতত্ত্ব-বিদ্দের অনুসন্ধানের ফল সংগ্রহ করিয়া যখন মানবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা (anthropologists) এ ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন, তখনই শুভ ফল ফলিয়াছে। মানবতত্ত্ববিদেরা যত্নপূর্ব্বক ভূ-স্তর পরীক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়াই মিশরের ঐতিহাসিক সভ্যতা ১০,০০০ বৎসরের কম প্রাচীন নয় বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে এখনও পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ভাল করিয়া ভূ-স্তর পরীক্ষার কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। ১০,০০০ বৎসরের পূর্ব্ব হইতে প্রাচীন-দিকে ৭০,০০০ বৎসর পর্য্যন্ত যে ভারতবর্ষে মানবলীলা অভিনীত হইয়া-ছিল, সে সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, প্রাচীন প্রস্তর-যুগ (Palæolithic age) হইতে নব-প্রস্তরযুগ (Neolithic age) এবং লৌহযুগ (Iron age) পর্য্যন্ত সময়ের যে সকল নিদর্শন অল্পমাত্র সংগৃহীত হইয়াছে, এখনও পর্য্যন্ত সেগুলি লইয়া কোন পণ্ডিত তীক্ষ্ণ বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত Indian Empire নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে লিখিত হইয়াছে যে, যাঁহারা প্রত্ন-তত্ত্বকার্য্যে ব্যাপৃত, তাঁহারা ঐতিহাসিক যুগের নিদর্শনগুলির বিচার করিতেই ব্যস্ত আছেন; প্রাচীনতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার তাঁহাদের সময় নাই। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে নিযুক্ত উপযুক্ত সমালোচক না হইলে এ কার্য্য কদাচ সুসম্পন্ন হইবে না। আমরাও সত্যের অনুরোধে লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া এ কথা বলিতে বাধ্য যে, যে বিদ্যা থাকিলে ঐ তত্ত্ব সমালোচনা করিতে পারা যায়, সে বিদ্যা আমাদের দেশের লোকের মধ্যে বিশেষ আছে কি না, সন্দেহ।

বহু প্রাচীন যুগের নরকঙ্কাল প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া Rhys, Beddoe,

Keane প্রভৃতি পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইউরোপের অধিবাসীরা কোন আর্য্যজাতির বংশধর নহেন। সুপ্রাচীন প্রস্তরযুগে ইউরোপে যাহারা বাস করিত, তাহারা নবপ্রস্তরযুগে এসিয়া হইতে আগত জাতিসমূহের সহিত মিলিত হইয়া ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্বেই যে সকল নূতন জাতির সৃষ্টি করিয়াছিল, এ কালের ইউরোপীয়েরা সম্পূর্ণরূপে তাহাদেরই বংশধর। যে সকল জাতির মধ্যে আর্য্যভাষা প্রচলিত হইয়াছিল তাহারা কখনও মূলতঃ আর্য্যজাতি ছিল না; আর্য্য সভ্যতা তাহাদের 'ধার-করা' জনিষ মাত্র। ভাষার একতা হইতে যে জাতির একতা প্রমাণিত হয় না, এ কথা বিশেষ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। আর্য্যদের প্রভাবে ভারতবর্ষের অনেক জাতিই আর্য্য ভাষায় কথা কহে; ভাষার একতা দেখিয়া কেহ ভবিষ্যতে ঐ সকল জাতির লোকদিগকে আর্য্যবংশীয় বলিয়া মনে করিলে বিশেষ ভ্রমে পড়িবেন।

ইউরোপে যে তথ্য সযত্নে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং হইতেছে, ভারতবর্ষে তাহার বিচার পর্য্যন্ত আরব্ধ হয় নাই। একে-ত ভূ-স্তর খননের কার্য্য কিছুমাত্র হয় নাই বলিলেই চলে, তাহার উপর আবার যতটুকু কিছু হইয়াছে, তাহা লইয়াও কোন অনুসন্ধান ও বিচার আরব্ধ হয় নাই। মির্জাপুর সহরের অনতিদূরে নবপ্রস্তরযুগের মানুষের যে পূর্ণ কঙ্কালটি পাওয়া গিয়াছিল, দুঃখের বিষয় যে এখনও পর্য্যন্ত তাহার উপযুক্ত পরীক্ষাদি হইল না। অনুসন্ধানের অভাবে এ কথা স্থির হইতে পারিল না যে, যাঁহারা ভারতে আর্য্য সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই ভারতবর্ষেরই প্রাচীনতম যুগের বংশধর, কি নহেন? ভারতবর্ষের আর্য্যেরা অন্য কোন দেশ হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া যে কথা আছে, তাহা ত মোক্ষমূলর প্রভৃতি ভাষাতত্ত্ববিদ্গণের একটা মন-গড়া মতবাদ হইতে উৎপন্ন। ভাষাতত্ত্ববিদ্দের এই জাতিতত্ত্বকথা এখন

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত-সমাজে উপহসিত মাত্র। যাহা হউক, আর্য্যজাতীয়-দের উৎপত্তি মূলতঃ ভারতবর্ষে কি না, এ কথা যখন মানবতত্ত্ববিদ্‌দের দ্বারা সুবিচারিত হয় নাই, তখন এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এ বিষয়ে বেশি কথা না বলাই ভাল।

একটি কথা কিন্তু পাঠকদিগকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে বলিতেছি। শ্রীযুক্ত মেক্‌ডোনেল প্রভৃতি পণ্ডিতেরা সুবিবেচনার সঙ্গে লিখিয়াছেন যে, সমগ্র বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিলে এ কথা কদাপি বুঝিতে পারা যায় না যে, বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা বা স্রষ্টারা ভারতবর্ষের বাহিরের অন্য কোন স্থানের বিষয় কিছুমাত্র জানিতেন। প্রাচীন জাতির মধ্যে এই একটি জিনিষ স্বাভাবিক দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্য কোন দেশ হইতে কিছু আসিলে বা তদ্রূপ অন্য কোন বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিলে সর্ব্বদাই সে সকল কথা জাতির ঐতিহ্যে রক্ষিত হয়। ভারতের আর্য্যেরা অন্য দেশ হইতে আসিয়াছিলেন, এ কথা বৈদিক কোন মন্ত্রে দূরভাবেও ঐতিহ্য (tradition) রূপে রক্ষিত হয় নাই। আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ হপ্‌কিন্স যে মন্তব্যটি লিখিয়াছেন, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না; তিনি লিখিয়াছেন যে, বেদমন্ত্রগুলির সম্বন্ধে ভৌগোলিক বিচার করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অধিকাংশ মন্ত্রই পঞ্জাব হইতে বহুদূর পূর্ব্বপ্রদেশে রচিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যদের প্রভাব যে ভারতের বাহিরে অন্যত্র বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, এ কথা এখন কয়েকটি নূতন তথ্য আবিষ্কারের পর প্রমাণিত হইয়াছে। একটি একটি করিয়া পাঠকদিগকে তাহাই বলিতেছি ঃ—

(১) বাবিলোনিয়ার ঐতিহাসিক যুগ যে ন্যূনকল্পে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে আরব্ধ হইয়াছিল, তাহা সুনিশ্চিত; কেননা সেই সময়কার

রাজাদের নাম পর্য্যন্ত জানিতে পারা গিয়াছে; ঐ সভ্যতার অভ্যুদয়ের বহুকাল পূর্ব্বে যে সুমেরিয়ান সভ্যতা ঐ দেশে বিকসিত হইয়াছিল, এ কথাও সুযুক্তি দ্বারা অনুমিত হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা গেল যে এখন হইতে প্রায় ৮,০০০ বৎসর পূর্ব্বে বাবিলোনিয়াতে ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ হইয়াছিল। যে প্রাচীনতম সুমেরিয়ান জাতির ভিত্তিতে বাবিলোনে কেঙ্গি (Kengi) সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, তাহারা জাতিতে আর্য্য না হইলেও আর্য্যদের ভাষা লাভ করিয়াছিল বলিয়া ডাক্তার এড্‌ওয়ার্ড হিঙ্কস্ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।* পণ্ডিতটির সিদ্ধান্ত তখন উপহসিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি যে সকল কথা প্রাচীন ভাষায় ideograph বা চিত্রবৎ লিপি পাঠ করিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই যথাযথ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই ভাষায় কর্ত্তৃকারকে 'স' (বিসর্গের রূপ মাত্র) এবং কর্ম্মকারকে 'ন্' ব্যবহৃত হইত। হিঙ্কস্ সাহেবের সিদ্ধান্ত ভুল হইতে পারে, কিন্তু এ কথা নির্ভুল যে, খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৮০০ সংবৎসরের যে কাশ জাতি বাবিলোনে 'হামুর্বি'র বংশধরদিগকে উচ্ছেদ করিয়া রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারা জাতিতে অনার্য্য হইলেও আর্য্য সভ্যতা দ্বারা নব শক্তি লাভ করিয়াছিলেন; এই কাশদের দেববর্গে 'সুরিয়স্' ঠিক সূর্য্য অর্থে পাওয়া যায়। বানান এবং উচ্চারণ সম্পূর্ণরূপে 'সূর্য্যঃ' শব্দের অনুরূপ। ইরাণদেশীয়েরা তাহাদের ভাষায় আর্য্য-ভাষাকে যে প্রকার প্রাদেশিক বিকৃতিতে লইয়াছিল, এখানে সেই প্রাদেশিক বিকৃতি নাই। কাশেরা যে বাবিলোনের বহু দূর পূর্ব্ব প্রদেশ হইতে আসিয়া দেশ জয় করিয়াছিল, এ কথা বাবিলোনের ইতিহাসে সুস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে যাহারা পূর্ব্বে বাস করিত, তাহারা যে ভারত হইতে বিস্তৃত আর্য্য সভ্যতা লাভ করে

* (J. R. A. S, IX, pp. 387-449.)

নাই, এ কথা বলিতে যাওয়া দুঃসাহসের কর্ম্ম। যাহারা রাজ্যলোভে পার্ব্বত্য প্রদেশ ভাঙ্গিয়া বাবিলোনে অধিকার বিস্তার করিতে গিয়াছিল, তাহারা সুবিধা থাকিলে কি প্রথমেই নিকটবর্ত্তী উর্ব্বর ভারতরাজ্যে প্রবেশ করিত না ? ভারতবর্ষে তখন প্রবল জাতির বাস ছিল বলিয়াই ঐ সুবিধা ঘটে নাই বলিতে হইবে। সুপ্রসিদ্ধ Sayce সাহেব লিখিয়াছেন যে, অতি প্রাচীন আসীরিয় চিত্র-লিপিতে 'সূর্য্য'কে 'মিত্র' নামে পাওয়া যায়। এই জাতিরও নাম মূলতঃ তাহাদের দেবতা 'অসুর' হইতে। 'অসুর' শব্দটি দেবতা অর্থে খাঁটি বৈদিক ; ইরাণীয় ভাষা হইতে উহার উৎপত্তি হইলে 'অসুর' স্থলে 'অহুর' হইত।

একদিন হিঙ্কসের কথা লোকে তুচ্ছ করিয়াছিল, কিন্তু এখন Hommel এবং Delitzsch আবিষ্কার করিয়াছেন যে, প্রাচীন সুমেরিয়ান ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বাবিলোনিয়ান জাতির ভাষায় ১০০ এমন শব্দ পাওয়া যায়, যাহাদের ধাতু আর্য্য শব্দ হইতে উৎপন্ন। Hommel অনেকগুলি খাঁটি আর্য্য শব্দ বাহির করিয়াছেন, এগুলি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবার জিনিষ।

(২) মিসর দেশের 'তেল্-এল-অমর্ণ' নামক স্থানে যে লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, অন্ততঃপক্ষে খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৬০০ সংবৎসরে এসিয়া মাইনরের 'মিতানি' নামক স্থানে যে রাজারা রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের নামকরণ বৈদিক ভাষায় হইত ; এবং তাঁহারা বৈদিক দেবতা পূজা করিতেন। ইঁহাদের নামের বর্ণবিন্যাসে ইরাণীর প্রাদেশিকতা নাই ; কাজেই এই জাতি সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভারতের আর্য্য সভ্যতা লাভ করিয়াছিল। মিতানির রাজা অর্ত্তত্ম, অর্ত্তযু-বর প্রভৃতি মিসর রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন ; এবং মিতানির রাজকুমারীদের প্রভাবেই মিসরের রাজপরিবারে উন্নত দেববাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।*

* (Roger's History of Babylonia, Vol. I., p. 110.)

'তেল্-এল্-অমর্ণ'এর আবিষ্কারের কিছুদিন পরে Cappadocia প্রদেশে Boghaz Kyoi নামক স্থানে শ্রীযুক্ত Winckler যে লিপি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা লইয়া পণ্ডিত-সমাজে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। ঐ লিপিতে যেরূপ বর্ণ-বিন্যাসে মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র এবং নাসত্য বা অশ্বিনী-কুমারদ্বয় লিপিবদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, মিতানিতে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় বৈদিক ধর্ম্ম ঠিক ভারতীয় ভাষায় প্রচারিত হইয়াছিল। 'র'ফলার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া হ্রস্বকে দীর্ঘ করিয়া পড়িবার নিয়মে ঐ লিপিতে 'মিত্র' কথাটি মি+ই+ত্র রূপে লিখিত আছে। বেদের মন্ত্রে যেমন মিত্র এবং বরুণ একসঙ্গে যুক্ত, এখানেও ঠিক তাহাই আছে। 'ইন্দ্র' নামটি ইন্+দ+র রূপে লিখিত আছে। বৈদিক যে মন্ত্র অতি প্রাচীন, তাহার ছন্দ বিচার করিয়া দেখিলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন যে প্রাচীন বৈদিকযুগে 'ইন্দ্র' ইন্+দ+র রূপে উচ্চারিত হইত। ইউরোপে এই লিপিটি লইয়া যত বাদবিচার হইয়াছে, তাহাতে ইন্দ্রের এই বর্ণ বিন্যাস যে ভারতের প্রাচীন ভাষার অনুরূপ, সে কথা কেহ দেখাইয়া দেন নাই; কাজেই আমরা এই নূতন কথাটি প্রমাণপ্রয়োগ দ্বারা উপস্থাপিত করিতেছি। বৈদিক যুগে যে অর্ব্বাচীন যুগের জটিল সন্ধির নিয়ম ছিল না, এবং সেরূপ সন্ধি করিলে যে মন্ত্রগুলিতে ছন্দের পতন হয়, সে কথা বিশেষভাবে এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বলা চলে না। এখানেও তাহার একটি উদাহরণ পাওয়া যাইবে। পদপাঠ অনুসারে ১ম মণ্ডলের ১৬৭ সূক্তের ১০ম ঋকটি লিখিলেও ছন্দের অনুসারে প্রাপ্য ১১টি অক্ষর পাই না। পদপাঠে আছে—"বয়ং অদ্য ইন্দ্রস্য প্রয়িষ্ঠাঃ"। কোন কোন স্থলে 'প্রয়িষ্ঠা' স্থলে 'প্রেষ্ঠা'ই রহিয়াছে। সেখানে একেবারে দুইটি syllable বা অক্ষর কমিয়া যায়। ই, ভি, আর্নল্ডের ছন্দের অনুযায়ী বৈদিক পাঠ অবলম্বন করিলে কুত্রাপি ছন্দের

গোল হয় না; এবং 'ইন্দ্র' স্থলে, কেবল এখানে নয়, অতি প্রাচীন মন্ত্রে সর্ব্বত্রই 'ইন্দর' পাওয়া যায়, যথা—

"বয়ং অন্ত ইন্দরস্ত প্রেয়িষ্ঠাঃ"।* ইন্দ্র ভারতের আর্য্যদের অতি প্রাচীন দেবতা। বেদে তাঁহার নাম "প্রত্ন" (৩য় মণ্ডল, ৪২,৯) এবং তিনি "প্রাচীপতি"; অথচ ভারতবর্ষের আর্য্যদের এই প্রাচীনতম দেবতা ইরাণীদের দেববর্গে স্থান পান নাই। ইন্দ্র সম্বন্ধে যে কথা, 'নাসত্য'দ্বয় সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। 'নাসত্য' শব্দ ইরাণী প্রাদেশিক ভাষায় 'নাহত্য' হইয়া গিয়াছে; এবং 'নাহত্য' 'অবেস্তা'য় একবচনে একজন দেববিদ্বেষী মাত্র। আর্য্যভাষা সম্বন্ধে ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ব-বিদেরা যাহাই বলুন, কিন্তু এ বিষয়ে সকলেরই এক মত যে, বেদমন্ত্রে দেবতাদি লইয়া যে ধর্ম্ম পাওয়া যায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভারতক্ষেত্রে সৃষ্ট বা উদ্ভূত হইয়াছিল। এরূপ স্থলে এ কথা অস্বীকার করিবার পথ নাই যে, বৈদিক উচ্চারণসহ যে সকল শব্দ অন্যত্র নীত হইয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত হইয়াছিল। জার্ম্মান ইয়াকবি যথার্থই বলিয়াছেন যে, নিশ্চয়ই ভারতপ্রান্ত হইতে মেসোপোটেমিয়া পর্য্যন্ত ভারতের আর্য্য-সভ্যতা একদিন প্রবলতা লাভ করিয়াছিল। ইঁহার মন্তব্যটি পাদটীকায় দিলাম।

ইউরোপের কয়েকটি জাতির উপরে আর্য্য-ভাষার কিঞ্চিৎ প্রভাব

* (Arnold's "Vedic Metre", p. 7.)

These tribes, being neighbours and perhaps subjects of Vedic tribes who had reached a higher level of civilization, adopted the Vedic gods, and thus brought the Vedic worship with them to their new homes in Mesopotamia (J. R. A. S., 1909, at p. 726).

দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। সুপ্রসিদ্ধ Keane সাহেব ইহাকে a mere veneer of Aryan culture অর্থাৎ আর্য্যসভ্যতার অতি অল্প এবং অগভীর প্রভাব বলিয়াছেন। যে সভ্যতা মেসোপোটেমিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিয়াছিল, তাহা যে কেবলমাত্র বিভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন দেশে গমনের ফলে ইউরোপে সংক্রামিত হইতে পারে নাই, এ কথা বলা যায় না।

যতদূর যাহা দেখা গেল, তাহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, যে সময়ে বাবিলোনিয়াতে ঐতিহাসিক যুগ আরব্ধ হইয়াছিল, ভারত-ক্ষেত্রে সে সময়ে অথবা তাহার পূর্ব্বে ঐতিহাসিক যুগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিচিত্র নহে। দেশের মাটির গুণে ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কীর্ত্তির কোন চিহ্ন পাওয়া না যাইবারই অধিক সম্ভাবনা। বিস্তৃতভাবে খনন-কার্য্য আরম্ভ হইলে কিছু পাওয়া যাইবে কি না, বলিতে পারা যায় না। অন্ততঃ পক্ষে ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্ব সময়ের নরকঙ্কালাদি পর্য্যালোচনা করিয়া যদি ভারতের প্রাচীনতম জাতির সহিত আর্য্য জাতির ধারা-বাহিকতা প্রমাণিত হয়, তাহা হইলেও প্রাচীন বৈদিক সভ্যতার সময়-নির্ণয় সম্বন্ধে অনেক সাহায্য হইতে পারিবে।

বাবিলোনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আর একটি কথা মনে হয়। কিছুদিন পর্য্যন্ত আসীরিয়ার লোকেরা স্বীয় দেশে পরিমিতভাবে সভ্যতা বিস্তার করিতে পারিয়াছিল বটে, কিন্তু পরে ক্ষুধার তাড়নায় উহাদিগকে অপেক্ষাকৃত দূর দেশে রাজ্য-বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। যে সকল স্থানে রাজ্য-বিস্তার করা কষ্টকর এবং যে সকল স্থানে ভূমি তেমন উর্ব্বরা ছিল না, সে সকল প্রদেশে যখন আসীরিয়গণ রক্তপাত করিয়া রাজ্যবিস্তার করিয়াছিল, তখন কেন যে তাহারা ভারত-বর্ষে প্রবেশ করে নাই, তাহা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না।

পশ্চিম প্রান্ত হইতে যদি সুবিধা পাইয়া একটা আর্য্যদল ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল, তখন কি সুতন্ত্রিত একটি রাজ্যের ক্ষমতা-শালী লোকেরা সেই পথে উত্তর-ভারতবর্ষ অধিকার করিতে আসিতে পারিত না ? মনে হয়, সিন্ধুর পরপারে ঐ আদিম কালেও একটা ক্ষমতা-শালী জাতি ছিল বলিয়াই আসীরিয়ার লোকেরা ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতে পারে নাই।

ইরাণীদের প্রাচীনতম ধর্ম্মশাস্ত্রের ভাষা পর্য্যালোচনা করিয়া পণ্ডিতেরা স্বীকার করিয়াছেন যে, বৈদিক মন্ত্রগুলির মধ্যে যে ভাষা অপেক্ষাকৃত খুব আধুনিক, ইরাণী ধর্ম্মগ্রন্থগুলি সেই ভাষায় রচিত। ইরাণের সে ভাষাও খাঁটি বৈদিক ভাষা নহে। উহা বৈদিকের একটি প্রাদেশিক ভাষা মাত্র। ঐ প্রাদেশিক ভাষায় অপেক্ষাকৃত নূতন যুগে বৈদিক ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত ভাবে রক্ষিত হইবার পূর্ব্বে যে খাঁটি ভারতবর্ষ হইতে, ইরাণ এবং ইরাণের পশ্চিমে, ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও ভাষা প্রচারিত হইয়াছিল মিতানির দৃষ্টান্তে তাহার প্রমাণ পাইলাম। কাজেই এ কথা বলা আদৌ সম্ভব হইবে না যে, ইরাণীদের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিবার পরে ঐ দেশের নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে ভারতের আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। বরং এই কথাই প্রতিপন্ন হইবার মত হইয়াছে যে, অন্যান্য জাতির মত ইরাণদেশীয়েরা ভারতের পশ্চিম-প্রান্তে আর্য্য সভ্যতার প্রভাবের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। ইরাণীদের সহিত বিচ্ছেদ বা বিবাদ ঘটিবার কথা ভারতবর্ষের বেদগ্রন্থে কুত্রাপি উল্লিখিত নাই। ইরাণীদের গ্রন্থে আছে যে, তাহারা 'আরিয়ান বইজ' বা আর্য্যব্রজ হইতে স্থানচ্যুত হইয়াছিল। সে স্থানচ্যুতি ভারতের আর্য্যদের তাড়নায় হইয়াছিল কি না, তাহা বলা যায় না। যদি হইয়াও থাকে, তবে ঐ ঘটনার প্রমাণে ইরাণীয় এবং ভারতবর্ষীয়দের মৌলিক একতা প্রতিপন্ন

হয় না। এ যখন অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগের কথা, তখন হইতে পারে যে, সিন্ধুপারে আর্য্যদের ক্ষমতা এক সময়ে প্রবল হইয়া উঠিবার পর ইরাণীয়েরা স্থানচ্যুত হইয়াছিল। কিন্তু তাহারও প্রমাণের অভাব। ইরাণের ধর্ম্মে, দেবতার নামে এবং অনুষ্ঠানে ভারতের ধর্ম্ম হইতে যে বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ স্বতন্ত্র ভাবে আলোচিত হইতে পারে।

যাহা হউক, এ প্রবন্ধে এই পর্য্যন্ত দেখা গেল যে, এখনও বহু পরিমাণে ভূ-স্তর পরীক্ষিত না হইলে ভারতের আর্য্যজাতির উৎপত্তি এবং তাহাদের সভ্যতাবিকাশের সময় সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারা যাইবে না।

বহির্ভারত

ভারতের পূর্ব্ব সীমান্ত হইতে টং-কিং উপসাগর পর্য্যন্ত এবং চীনের দক্ষিণভাগ হইতে ভারত-সাগর পর্য্যন্ত বহু-বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড Farther India বা বহির্ভারত নামে এখনও প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। একদিন যে ঐ সমগ্র ভূভাগ ভারতবর্ষের অধীনে ছিল, এবং ভারতবর্ষের সভ্যতা উহাকে উন্নত করিয়াছিল, এ কথা এখন অনেকেই জানেন না। প্রথমতঃ ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বহির্ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করিতেছিলেন বলিয়া তাঁহাদের আবিষ্কৃত তত্ত্বের সহিত আমরা সহসা পরিচিত হইতে পারি নাই। তাহার পর ফেয়ার (Phayre) সাহেব যখন ব্রহ্মদেশের ইতিহাস লিখিলেন (সেও অল্পদিনের কথা নয়), তখন ভারতের প্রাচীন শৌর্য্য এবং মহিমার কথা কথঞ্চিৎ পরিমাণে জানিতে পারা গিয়াছিল। কার্ণেল জেরিনি (Colonel Gerini) যখন রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির অনুরোধে তাঁহার সুদীর্ঘ ভৌগোলিক তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন, তখন ভারতের অতি প্রাচীন কালের অধিকার-বিস্তৃতির বিবরণ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। যতই প্রত্নতত্ত্ব সংগৃহীত হইতেছে, ততই অনেক মঙ্গোলীয় জাতির সভ্যতার মূলে ভারত সভ্যতার বীজ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

ব্রহ্ম, শ্যাম, কম্বোজ, আনাম প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা, বৌদ্ধ বলিয়া আমরা কেবল এইটুকু জানিতাম যে বৌদ্ধ শ্রমণেরা ঐ সকল দেশের লোকদিগকে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া নূতন সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন ;

কিন্তু বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতে যে ভারতবাসীরা ঐ সকল দেশ জয় করিয়া "অতিরিক্ত ভারত রাজ্য" স্থাপন করিতেছিলেন, আমরা সে কথা জানিতাম না। পুরাণগুলিতে ঐ ঐতিহাসিক ঘটনার কিছু কিছু নিদর্শন আছে; কিন্তু মূল ঘটনাগুলি অজ্ঞাত ছিল বলিয়া, সে নিদর্শন হইতে পূর্ব্বে কিছুই বুঝিতে পারা যায় নাই। এ বিষয়ে যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা অল্প পরিমাণে সূচিত করিবার জন্যই এই প্রবন্ধটি লিখিতেছি।

আর্য্যেরা যখন দ্রবিড়জাতীয় লোকদের কোন সন্ধান লইতেন না, কিন্তু দ্রবিড়জাতীয়েরা আর্য্য-সভ্যতা সংগ্রহ করিয়া নব তেজে উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, তখনও দ্রবিড়জাতীয়েরা স্থলপথে এবং জলপথে বহির্ভারতের অনেক স্থলে উপনীত হইয়া অনেক রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৯০০ সংবৎসরেও ব্রহ্মদেশে এই দ্রবিড় অধিকারের বিবরণ পাওয়া যায়। মুডু-কলিঙ্গ অথবা ত্রি-কলিঙ্গের অধিবাসীরা যে অতি প্রাচীনকালে পেগু, তেনাসেরিম, আরাকান প্রভৃতি দেশ জয় করিয়াছিল, চোলমণ্ডল বা করমণ্ডলের অধিবাসীরা যে মলয় উপদ্বীপ, কম্বোজ প্রভৃতি অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিল, এবং বঙ্গ-দেশের প্রাচীন দ্রবিড় অধিবাসীরা যে আনাম দেশ অধিকার করিয়া খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত আনামে রাজত্ব করিয়াছিল, সে কথা জেরিনির গ্রন্থে সুস্পষ্ট উল্লিখিত (৪২৯ পৃষ্ঠা) হইয়াছে। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব সময়েই আর্য্যেরা প্রধানতঃ আসাম (প্রাগ্‌জ্যোতিষ) এবং মণিপুর প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়া ব্রহ্মদেশের উত্তরভাগ, শ্যামরাজ্য, আনাম এবং চীনের দক্ষিণভাগের যুন্নান ও টং-কিং রাজ্যসমূহে অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন; এবং পরে সমগ্র দ্রবিড়জাতীয় লোকদিগকে পরাভূত করিয়া বহির্ভারত এবং চীনরাজ্যের অংশবিশেষে আর্য্যসভ্যতা বিস্তার

করিয়াছিলেন। চীন এবং ব্রহ্মদেশের ইতিহাস হইতেই এই সকল কথা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

দ্রবিড়জাতীয়েরা যেমন দেশ অধিকার করিয়া ব্রহ্মদেশে আপনাদের ত্রিকলিঙ্গ প্রভৃতি নাম স্থাপন করিয়াছিল, আর্য্যেরাও তেমনি ভারত-বর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক নাম দিয়া বহির্ভারতের পর্ব্বত, নদী, দেশ ও নগরগুলিকে চিহ্নিত করিয়াছিলেন। সেই চিহ্ন হইতেই আর্য্য-জাতির প্রাচীন অধিকার-বিস্তারের কথা যে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়, পাঠকেরা তাহা দেখিতে পাইবেন। ব্রহ্মদেশের প্রবাদ ও লিখিত বিবরণ, এবং অসম্পর্কিত চীন দেশের ইতিহাস, এই প্রাচীন বিবরণের সাক্ষী। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে কার্ণেল জেরিনি প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা এ কথা উদ্ধার করিয়াছেন যে উত্তর ব্রহ্মের ভামো নগরে হস্তিনাপুর হইতে আগত ক্ষত্রিয় রাজারা খৃঃ পূঃ ৯২৩ অব্দে রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজ্য ব্রহ্মদেশের উত্তর সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া মণিপুর সীমান্ত দিয়া ইরাবতী-তটস্থ পাগান নগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খৃঃ পূঃ ৬৪৪ অব্দে শ্যামদেশের সমগ্র উত্তর ভাগ মালব নামে প্রচারিত হইয়াছিল, এবং উহার প্রধান নগরের নাম হইয়াছিল দর্শাণা*। এখনও শ্যামের উত্তরভাগের 'মালা প্রাথেট' নাম (মালব প্রদেশ) এবং প্রধান নগরের 'দশাণ' বা 'দোয়াণ' নাম লুপ্ত হয় নাই। যিনি প্রথম এই রাজ্যটি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম সুনন্দকুমার বলিয়া পাওয়া গিয়াছে। এই রাজ্য এতদুর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে খাস চীনরাজ্য-ভুক্ত য়ুন্নানটি সুনন্দকুমারের বংশধরদের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল। পার্ব্বত্য সীমান্ত বলিয়া, ভারতবর্ষের দেশসংস্থিতির অনুকরণে এই য়ুন্নান্-রাজ্য, "গান্ধার" বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল। চীনের ইতিহাসেও এ কথা

* (Muang Yong Chronicleএর জেরিনি প্রদত্ত বিবরণ।)

স্বীকৃত হইয়াছে। যখন টং-কিং এবং উত্তর আনাম এই দেশভুক্ত হয়, তখন আনামের উত্তর-পূর্ব্ব ভাগ মিথিলা নাম পাইয়াছিল ; এবং বিদেহ বলিয়া তাহার পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। শ্যামদেশের পূর্ব্বভাগে চম্পা নামে একটি নগরীও এক সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল। এ নামগুলি কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র ; কিন্তু লুপ্ত হয় নাই।

বহির্ভারতের উত্তরভাগের এই বিবরণ লক্ষ্য করিয়া কার্ণেল জেরিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাদটীকায় উদ্ধৃত করিতেছি।

তাহার ভাবার্থ এই যে, উত্তর হিন্দু-চীন দেশ ইহার প্রাথমিক সভ্যতার জন্য উত্তর ভারতের নিকট ঋণী। উত্তর ব্রহ্ম, শ্যাম, লওস, য়ুন্নান,

"Northern Indo-China owes its early civilization to settlers' from Northern India" (p. 22).

পুনরপি লিখিয়াছেন :—

"We find Indu [Hindu] dynasties established by adventurers claiming descent from the Kshatriya potentates of Northern India ruling in Upper Burma, in Siam and Laos, in Yunnan and Tonkin and even in most parts of South-eastern China. From the Brahmaputra and Manipur to the Tonkin Gulf we can trace a continuous string of petty States ruled by the scions of the Kshatriya race, using the Sanskrit or the Pali languages in official documents and inscriptions, building temples and other monuments after the Indu [Hindu] style' and employing Brahman priests for the propitiatory ceremonies connected with the Court and the State (p. 122)......The presence of this Indu [Hindu] element and its influence upon the development of Chinese civilization at a far earlier period than has hitherto been known or even suspected, commands attention, and can henceforth be hardly overlooked by Sinologists" (p. 124).

টং-কিং এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব চীনের অনেক অংশে ক্ষত্রিয় রাজ্যের চিহ্ন এবং সংস্কৃত ও পালি ভাষা ব্যবহারের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। চীনের প্রাচীন সভ্যতাও অনেক অংশে ভারত-সভ্যতার নিকট ঋণী।

আর্য্যজাতির প্রভাবে যখন দ্রবিড়জাতীয়দের অধিকৃত রাজ্য আর্য্যের শাসনে আসিয়াছিল, তখন পেগুর ত্রিকলিঙ্গ-রাষ্ট্র প্রথমতঃ 'সুবর্ণভূমি' এবং পরে 'রামণ্য দেশ' নামে অভিহিত হইয়াছিল। ব্রহ্ম-দেশের অতি প্রাচীন বিবরণে যে স্থানের কলিঙ্গরট্ট নাম পাওয়া যায়, সেখানে এখনও অনেক তেলেগু নামের অপভ্রংশ প্রচলিত আছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে পেগু হইতে তেনাসেরিম পর্য্যন্ত সুবর্ণভূমি নাম পাওয়া যায়। ভারতের বৌদ্ধজাতক গ্রন্থে সমুদ্রপারের যে সুবর্ণভূমির কথা বর্ণিত আছে, তাহা এই সুবর্ণভূমি। ব্রহ্মদেশের কল্যাণীর খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে পরবর্ত্তী সময়ে ঐ প্রদেশ কখন বা সুবর্ণভূমি, কখন বা রামণ্যদেশ নামে অভিহিত হইত। উহার একটির উপরিভাগ কুশিমমণ্ডল নামে (এ কালের Bassein), একটি হংসবতীমণ্ডল নামে (পেগু) এবং তৃতীয়টি মূর্ত্তিনগুল নামে (Martaban) অভিহিত হইয়াছিল। এই নাম ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল; কেননা পেগুর রাজা (থম্মচেতা) ধর্ম্মচেতা ঐ বৎসরে যে খোদিত লিপি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও ঐ নামগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রদেশ হইতে যে যথার্থ ই ভারতের জন্য স্বর্ণ সংগৃহীত হইত বলিয়া সুবর্ণভূমি নাম হইয়াছিল, তাহা দেশের স্বর্ণ-খনি হইতেই সূচিত হয়।

মালয়-উপদ্বীপের উত্তরভাগে যে স্থানে এখনও স্ব: পাওয়া যায়, সেই বিভাগের নাম জম্বী। জম্বী বিভাগের নদী হইতে স্বর্ণ সংগৃহীত হইত বলিয়াই হয়-ত স্বর্ণের "জাম্বুনদ" নাম হইয়াছিল। এটি আমার নিজের অনুমান। অতি প্রাচীন সংস্কৃতে স্বর্ণের জাম্বুনদ নাম নাই; কি কারণে

ঐ নামের উৎপত্তি হইল, তাহাও যখন জানা যায় না, তখন জম্বী প্রদেশের সুবর্ণের সহিত জাম্বুনদ কথাটি গ্রথিত করিতেছি।

ভারতবর্ষের পূর্ব্বভাগের কমিলা (কমিল্লা), চট্টল (চট্টগ্রাম) এবং আরাকান লইয়া দ্রবিড়দের ত্রিকলিঙ্গ রাজ্যের একটি উপরিভাগ সৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তখনও কমিলার পার্ব্বত্য প্রদেশ, শিলাচট্টল (শ্রীহট্ট বা সিলেট) এবং মণিপুর প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে কিরাতদের অধিকারে ছিল। ত্রিপুরার 'রাজমালা' গ্রন্থে পাওয়া যায় যে ত্রিপুরা দেশ প্রথমে কিরাত-রাজ্য ছিল। আলোসন্ধ (শিলং) দেশও সম্ভবতঃ কিরাতজাতির অধিকৃত ছিল।* যখন ঐ ভূভাগের অধিকাংশ স্থল আর্য্যের অধিকারে আসিয়াছিল, তখন প্রাচীন ত্রিরাজ্যের নামের ঐতিহ্যে চট্টগ্রাম, কমিলা এবং ত্রিপুরা লইয়া নূতন ত্রিপুরারাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অর্থাৎ ব্রহ্মে হউক, ভারত সীমান্তে হউক, কুত্রাপি দ্রবিড়জাতীয়দের প্রাধান্য রক্ষিত হইতে পারে নাই। তবে ভারতবর্ষের হিন্দুগণ যখন ব্রহ্মদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিবার পর ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের সুন্দরীদিগকে তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বংশের জননীরূপে বরণ করিয়া প্রাচীন দেশের মায়া কাটাইয়াছিলেন, তখন ভারতবাসীদের বিচারে তাঁহারা ঠিক্ হিন্দু বলিয়া বিচারিত হয়েন নাই। এখন বহির্ভারতের মধ্যে কেবল শ্যামদেশ স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে। এই শ্যামদেশের রাজবংশীয়েরা আপনাদিগকে ভারতের ক্ষত্রিয়সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

বহির্ভারতে আর্য্যের কীর্ত্তি এখনও লুপ্ত হয় নাই। আনামের অতি সুন্দর মন্দিরগুলি আমাদেরই পিতৃব্যবংশীয়েরা গড়িয়াছিলেন। সকল

* (Proceedings, A. S. B., Jan. 1874.)

প্রত্নতত্ত্ববিদেরাই বলিতেছেন, উহা হিন্দু-কীর্ত্তি। খাঁটি চীনজাতীয় লোকের সৌন্দর্য্য তোমার আমার চক্ষে এখন তেমন মনোজ্ঞ না হইতে পারে, কিন্তু আর্য্যরক্ত-সংমিশ্রণে বহির্ভারতে নরনারীর যে সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হইয়াছে, তাহা ত মনোজ্ঞ নহে বলিয়া কেহই বলেন না। মেখং নদীর উত্তরভাগ একদিন যমুনা নদী নাম পাইয়াছিল এবং উহার অন্য অংশের নাম হইয়াছিল গঙ্গা। ঐ গঙ্গা এবং যমুনা ভারতের নদী দুইটির মতই লোকের দৃষ্টিতে পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়।

এক দিন যখন আর্য্যরক্তপূত (Lao) লাও জাতি উত্তরব্রহ্মদেশ হইতে আসিয়া পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থান অধিকার করিয়াছিল, তখন যদিও লাওজাতি আর্য্যভাষায় কথা কহিত না, তবুও ঐ লাও-অধিকার দ্বারা কিরাতজাতির প্রভাব দূরীভূত হইয়াছিল। লাওএরা নিজের ভাষায় স্বদেশের নদী নগরের নাম অনেক রাখিয়া গিয়াছিল। এখনও তাঁহার অনেক চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। মেখং কিংবা মান্-ওয়াঙ্গএর অপভ্রংশে 'মেঘনা' নাম রহিয়া গিয়াছে; 'মান্-ওয়াঙ্গ' অর্থ মেঘবতী। অর্থে এবং উচ্চারণে প্রাচীন চিহ্ন লুপ্ত হয় নাই। ব্রহ্মের ভাষায় "ঢক্কা" অর্থ প্রাচীন নদী বা "পুরাতন গঙ্গা"। সেই ঢক্কার অনুবাদে "বুড়ী-গঙ্গা" নদীটি রহিয়াছে, এবং তাহার কূলে সাক্ষাৎ ঢাকা-নগরী বর্ত্তমান। যে সময়ে এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তখন ব্রহ্মদেশের লোকের ভারত-অভিযান, "মগের উৎপাতে" পরিণত হয় নাই।*

* বঙ্গদেশের পঞ্জিকায় লাওসেন বলিয়া যে নরপতির নাম পাওয়া যায়, সে নামটি "লাও" বংশের রাজত্বের স্মৃতিতে কল্পিত হয় নাই ত? ধর্ম্ম-দেবতার মাহাত্ম্য-বর্ণিত প্রাচীন গ্রন্থেও যে অনির্দ্দিষ্ট লাওসেন পাওয়া যায়, তাহাও যেন "লাও" বংশের লোকের কথা বলিয়া মনে হয়।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষীয়েরা বহির্ভারত অধিকার করিতেছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের সময় হইতে আর্য্যপ্রভাব বহির্ভারতের সর্ব্ব অঙ্গে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৪৪৩ অব্দে নূতন প্রোম নগরীর ছয় মাইল দূরে শ্রীক্ষেত্র নামক নূতন নগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে এই দেশ মৌর্য্যরাজাদের শাসনাধীন হয়। খৃষ্টোত্তর দুই তিন শতাব্দী পর্য্যন্তও প্রোম এবং পাগানের রাজবংশীয়েরা মৌর্য্য-বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবি করিতেন। চীনদেশের ইতিহাস হইতে ই, এইচ, পার্কার সংগ্রহ করিয়াছেন যে, সে দেশের ঐতিহাসিক প্রবাদ এই যে, শ্রীধর্ম্মাশোকের পঞ্চম পুত্র য়ুন্নান রাজ্য অধিকার করিয়া সেখানে মৌর্য্য-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্যামদেশ বা সামরট্টেও মৌর্য্য-রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া খৃঃ পূঃ ১২২ অব্দের শ্যামদেশের একটি বিবরণে জানিতে পারা যায়। চোরমণ্ডল বা কর-মণ্ডলের অধিবাসী কর্ত্তৃক পর্ব্বতসঙ্কুল যে দেশ মলয় নামে (তামিলে 'মলয়' অর্থ পর্ব্বত) অভিহিত হইয়াছিল, উহাও মৌর্য্যশাসনে আসিয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। আশ্চর্য্য এই যে, বহু পরবর্ত্তী সময়েও হিন্দুরা নিকটবর্ত্তী ভারতবর্ষ হইতে গিয়া ব্রহ্মদেশে অধিকার বিস্তার করিতেন। এলাহাবাদে সমুদ্রগুপ্তের যে প্রস্তরলিপি আছে, তাহাতে সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক "ডবাক" রাজ্য-জয়ের কথা পাওয়া যায়। এই ডবাক রাজ্য যে উত্তর ব্রহ্মদেশের জেরিনি তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি দেখাই-য়াছেন যে, পাগান্ নগরে যে একখানি খোদিতলিপি পাওয়া গিয়াছে, সে খানিতে ১৬৩ গুপ্ত সংবৎ ব্যবহৃত আছে। ডবাক নামটি যে এখনও লুপ্ত হয় নাই, তাহাও তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। আনাম দেশের প্রাচীন চম্পানগরীতে একটি খোদিতলিপি পাওয়া গিয়াছে; ঐটিতে ১৫০ খৃষ্টাব্দের গির্ণারের খোদিতলিপির অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়।

তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতেও ভারত হইতে অনেক লোক ব্রহ্মদেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতেছিলেন। শ্যামদেশের সম্বোর নামক স্থানে জয়বর্ম্মন নামক রাজা শম্ভুপুর স্থাপন করিয়াছিলেন। ৯৪৭ খৃষ্টাব্দে জয়বর্ম্মণের পূর্ব্বপুরুষ শ্রুতবর্ম্মণ, কম্বোজে 'কম্বু নামে মহাদেব বা শম্ভু স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

কার্ণেল জেরিনি অতি যোগ্যতার সহিত দেখাইয়াছেন যে পুরাণে বর্ণিত ভারতবর্ষের বাহিরের অনেকগুলি দ্বীপ বহির্ভারতের কতকগুলি দেশের সহিত অভিন্ন। পাঠকদের নিকট সকল প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে পারিতেছি না। লবণসমুদ্র-বেষ্টিত জম্বুদ্বীপ বা ভারতবর্ষের পরে অন্য যে সকল দ্বীপের কথা বলা হইয়াছে, সংক্ষেপে সে কথা কিছু কিছু বলিতেছি।

সর্পিঃ-সাগর-বেষ্টিত প্লক্ষ দ্বীপটি আরাকানের নিকটস্থ ব্রহ্মদেশের নিম্ন-ভাগ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। প্রথমতঃ প্রকৃতপক্ষে এই দেশ প্লক্ষবৃক্ষ-পরিপূর্ণ, অন্যদিকে আবার সুখদ দেশ বা শ্যামদেশের পশ্চিমে পো-লো-সো দেশ বলিয়া একটি দেশের কথা চীনদেশের কথা-বিবরণে পাওয়া যায়। পর্ত্তুগীজেরা ষোড়শ শতাব্দীতেও নিম্ন ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী সাগরকে Mare di Serpe অর্থাৎ সর্পসাগর বলিয়া দেশপ্রবাদ হইতে নাম দিয়াছিলেন। Serpe বা সর্প, "সর্পিঃ" হইতেই হইয়াছে। পরবর্ত্তী দ্বীপগুলির নিদর্শন হইতে এ কথা আরও সুস্পষ্ট হইবে। *

সুরা-সাগর-বেষ্টিত শাল্মলী দ্বীপটি মালয় উপদ্বীপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যদিও এখানে বহু পরিমাণে শাল্মলীবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়,

---

* সর্পি শব্দটী ভারতবর্ষে ঘৃত অর্থেই ব্যবহৃত হইতেছে, কিন্তু নাম-সাদৃশ্যে ভিন্ন অর্থও উৎপন্ন হইয়াছে।

তথাপি জেরিনি বিবেচনা করেন যে "সুবর্ণমালী" কথা হইতেই শাল্মলী দ্বীপ নাম হইয়াছে। শ্যামদেশের প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে তেনাসেরিম প্রদেশস্থ সুবর্ণমালী গিরির উপরে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন আছে বলিয়া লিখিত আছে। পেগুর একখানি খোদিতলিপিতে মালয় উপদ্বীপকে শাল্মলী দ্বীপ এবং সুবর্ণমালী দ্বীপ এই দুই নামেই অভিহিত করা আছে। রামায়ণে সুরাসাগরের নাম পাওয়া যায় 'শ্রীলোহিত'। এই সাগরের চীন-দেশের নামেও লোহিত অর্থ পাওয়া যায়। আরব দেশের লোকেরা ইহাকে 'সেলাহেট' নাম দিয়াছিল ; ঐ শব্দটি শ্রীলোহিতের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

সমগ্র শ্যাম দেশটি শাকদ্বীপ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এই ক্ষীর-সাগরবেষ্টিত দ্বীপটির কতকগুলি প্রাচীন এবং পৌরাণিক লক্ষণের কথা বলিতেছি। শ্যামদেশের নিকটবর্ত্তী সাগরটির দেশভাষায় কেদ্‌রেঞ্জ বা কেরদেঞ্জ নাম ছিল। বিষ্ণুপুরাণের মতে শাক বৃক্ষ (সেগুন বা Teak) বেশি ছিল বলিয়া এই দ্বীপের ঐরূপ নামকরণ হইয়াছিল। শ্যামদেশে শাক বা সেগুন গাছের খুব আধিক্য ; এবং উহার নাম মৈ-শাক। বিষ্ণু-পুরাণে এ কথাও আছে যে "ভব্য" নামে নরপতি শাকদ্বীপের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন এবং তাঁহার পুত্রের সময়ে জলদ, কুমার এবং সুকুমার প্রভৃতি নামে দেশের বর্ষবিভাগ হয়। পুরাণে উল্লিখিত ঐ দেশের পর্ব্বত-গুলির মধ্যে উদয়গিরি, অস্তগিরি এবং শ্যামগিরি নাম পাওয়া যায় এবং সুকুমারী, কুমারী ও নলিনী নামে নদীর নাম পাওয়া যায়। কম্বোজ দেশের ৬০০ খৃষ্টাব্দের খোদিতলিপিতে যথার্থতঃই ভববর্ম্মণ রাজার নাম পাওয়া যায়। ইনি খোদিতলিপি প্রস্তুত হইবার পূর্ব্ব সময়ে অভ্যুদিত হইয়াছিলেন। জেরিনি বলেন যে শ্যাম দেশের ভাষায় C'honla শব্দের অর্থ "জল," এবং জল শব্দটি ঐ দেশের উচ্চারণে প্রায় ঐরূপ দাঁড়ায়।

মেখং উপত্যকার জলপ্রায় বিভাগটির নাম C'honla। শ্যাম এবং কম্বোজের দক্ষিণভাগে কুমারী নদী এবং অন্তরীপ আছে। ঐ কুমারীনদী-ধৌতপ্রদেশকেই কুমারবর্ষ মনে করা হইয়াছে। আরবদের একটি প্রাচীন বর্ণনা হইতেও ঐ প্রদেশের 'কোমর' নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্যামদেশে 'উদৈ' এবং 'লেস্তৈ' Lestai নামে যে দুই পর্ব্বত পাওয়া যায়, তাহাই উদয়গিরি এবং অস্তগিরি বলিয়া নিশ্চিত হইতেছে। ভাগবত পুরাণের পূরোজব এবং মনোজব নামের অনুরূপ লাউজবা অথবা Lau C'hwa নাম পাওয়া যায়। শ্যাম দেশের প্রাচীন নাম সামরট্ট বা শ্যামরাষ্ট্র। বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনায় আছে যে ভব্যের পুত্র বর্ষবিভাগ করিয়াছিলেন। শ্যাম ও কম্বোজের প্রাচীন বিবরণে পাওয়া যায় যে ভববর্ম্মণের পুত্র ঈশানবর্ম্মন ৬২৭ খৃষ্টাব্দে কম্বোজ জয় করিয়াছিলেন। এই কম্বোজের দক্ষিণেই কুমারবর্ষ।

শ্যামদেশের প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিব। শ্যাম দেশের তিনটি স্থানে প্রধান নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল জানা যায়; যথা সুখৈ বা সুখদ, দ্বারবতী, এবং আয়ুথিয়া বা অযোধ্যা। বিষ্ণুপুরাণে সুখোদয় নামক স্থানকে প্লক্ষদ্বীপ বা ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত বলা হইয়াছে। কিন্তু "সুখৈ" শ্যাম দেশে স্থিত হইলেও ব্রহ্মের ঠিক্ সীমান্তে অবস্থিত। শ্যামদেশের পূর্ব্বদিকে প্রাচীন সরযূ নদী প্রবাহিতা। অপভ্রংশেরও অপভ্রংশে এখন সরযূ নদী Hsiyu নামে প্রসিদ্ধ। এদেশের ব্রাহ্মণেরা অর্থাৎ পৌরোহিত্যকার্য্যকারীরা "আচান্" নামে পরিচিত। আচান কথাটি আচার্য্য শব্দের অপভ্রংশ। আমাদের দেশের আচার্য্য ব্রাহ্মণেরা বলেন যে, তাঁহারা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ; এবং পূর্ব্বে তাঁহারা সরযূতীরবাসী ছিলেন; এবং সেই স্থান হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। আমরা শ্যামদেশকে শাকদ্বীপ বলিয়া পাইতেছি; সেখানে সরযূ নদীও পাইতেছি; এবং

ব্রাহ্মণগুরুর সাধারণ নাম আচান বা আচার্য্য বলিয়া পাইতেছি। ইহা হইতে কোন সিদ্ধান্ত করা চলে কিনা, তাহা পাঠকেরা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। শ্যামের রাজারা অল্পকাল হইল, অযোধ্যার রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া বেঙ্ককে রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন। এখন যিনি শ্যামের অধিপতি, তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। এই শিক্ষিত মহারাজাও আপনাকে ভারতের ক্ষত্রিয়সন্তান বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন।

বহির্ভারতের আর্য্যজাতির কীর্ত্তির কথা অতি অল্পই বলা হইল।